POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يُزَكُّوۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىۡ مَنۡ يَّشَآءُ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا ○

তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবি করে? বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর খেজুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৫০)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সংখ্যা 36

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 3 রা সেপ্টেম্বর, 2020 ● 14 মহররম 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ফজর ও এশার নামাযের গুরুত্ব

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: মুনাফিকদের জন্য ফজর এবং এশার নামাযের থেকে বেশি ভারি আর কোনও নামায নেই। তারা যদি জানত যে এই নামায দ্বয়ে কি পুণ্য রয়েছে তবে, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই নামাযে আসত। আমার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হল যে, মুয়াজ্জিনকে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এক ব্যক্তিকে ইমামতি করতে বলি। অতঃপর আগুন নিয়ে এসে সেই সব লোকেদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিই, যারা এখনও নামাযের জন্য বের হই নি।

(সহী বুখারী, বাব ফযলুল ইশা ফিল জুমাআ)

● হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফিরিশতারা রহমতের দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে জায়ে নামাযে থাকে, তবে শর্ত হল সে যেন ওজুহীন না হয়ে পড়ে। (ফিরিশতারা বলে) হে আল্লাহ্! একে ক্ষমা কর! হে আল্লাহ্! এর উপর দয়া কর। তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের জন্য থেমে থাকে। তবে নামায ছাড়া অন্য কোনও বিষয় যেন তাকে নিজের পরিবারের দিকে ফিরে আসতে বাধা না দেয়।

(সহী বুখারী, বাব মান জালাসা ফিল মসজিদ)

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চ্যালেঞ্জ

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩১ জুলাই, ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)

মানুষের হৃদয়ও 'হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) সদৃশ এবং তার বক্ষ বায়তুল্লাহ্‌র সদৃশ। পবিত্র মক্কার প্রতিমাগুলি সেই সময় সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল যখন আমাদের নবী করীম (সা.) দশ হাজার পবিত্র সৈন্যদল নিয়ে মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন। কাজেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের প্রতিমাদের পর্যদুস্ত করতে এবং সমূলে উৎপাটন করতে সেগুলির উপরও অনুরূপ আক্রমণ আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

একথা সর্বান্তকরণে স্মরণ রেখো যে যেভাবে বায়তুল্লাহ্-য় 'হাজরে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ প্রস্তর) স্থাপিত রয়েছে, অনুরূপে আমাদের বক্ষে রয়েছে হৃদয়। বায়তুল্লাহকেও এমন এক সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে যখন কাফেররা সেখানে মূর্তি সাজিয়ে রেখেছিল। সম্ভব ছিল যে বায়তুল্লাহ্ এমন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হত না, কিন্তু তা হয় নি- আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে এক নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন। মানুষের হৃদয়ও 'হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) সদৃশ এবং তার বক্ষ বায়তুল্লাহ্ সদৃশ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া প্রতিমা সদৃশ যা তার কাবায় স্থান পায়। পবিত্র মক্কার প্রতিমাগুলি সেই সময় সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল যখন আমাদের নবী করীম (সা.) দশ হাজার পবিত্র সৈন্যদল নিয়ে মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন। সেই দশ হাজার সাহাবাকে পূর্বের ঐশীগ্রন্থ সমূহে ফিরিশতা নামে উল্লেখ করা হয়েছে আর বাস্তবেও তাদের মহিমা ফিরিশতাদের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। মানবীয় মৌলিক মানসিক শক্তিও ফিরিশতাদের মর্যাদা রাখে। কেননা যেরূপ ফিরিশতাদের মহিমায় বর্ণিত হয়েছে- يَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ (অর্থাৎ তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা সেটিই পালন করে-অনুবাদক) । (আননহল, আয়াত: ৫১) অনুরূপভাবে মানবীয় মৌলিক শক্তিবৃত্তির বিশেষত্ব হল, তাকে যা আদেশ করা হয় তা পালন করে।

অনুরূপভাবে মানুষের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের আজ্ঞাধীন। কাজেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের প্রতিমাদের পর্যদুস্ত করতে এবং সমূলে উৎপাটন করতে সেগুলির উপরও অনুরূপ আক্রমণ আবশ্যক। এরজন্য প্রয়োজনীয় বাহিনী (শক্তি) প্রস্তুত হয় আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। এবং তাকেই বিজয় দান করা হয় যে নিজেকে পবিত্র করে। এই কারণে কুরআন করীমে বলা হয়েছে যে قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰٮهَا (সূরা শামস, আয়াত: ১০) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি অন্তরের সংশোধন হয়ে যায়, তবে শরীরেরও সংশোধন হয়ে যায়। এটি কেমন বিচিত্র সত্য যে চোখ, কান, হাত, পা জিহ্বা ইত্যাদি যতসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, বস্তুত সেগুলি সবই অন্তরের আজ্ঞাবাহক। মনের মধ্যে কোনও ভাবনার উদ্রেক হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি তৎক্ষণাত তা পালনে উদ্যত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ:১৭২,)

আমি সব সময় একথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, কোনও মুসলমানও কি কখনও কবরে সিজদা করতে পারে?

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ

সূরা বাকারার ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

এই আদেশাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা সেগুলি গ্রাহ্য করতো না; স্বজন থেকে বিজন, প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের দুর্ব্যবহার ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। এমনকি তাদের মধ্যে কিছু মানুষ হযরত আযীরকে খোদার পুত্র আখ্যায়িত করতে শুরু করেছিল। যেমন, ইয়েমেনের দিকে বসবাসকারী ইহুদীদের সিদ্দুকী ফির্কা এই শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং কিছু মানুষ উলেমাদের প্রত্যেক আদেশকে খোদার ওহী হিসেবে বিশ্বাস করত এবং নিজেদের ঐশী গ্রন্থের আদেশাবলীকে পেছনে ফেলে রাখত। এতীম ও মিসকীনদের প্রতি তারা সদাচারী ছিল না। এবং তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভুতি ছিল না। ইবাদতের বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করত এবং যাকাতকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করত। যেমন বর্তমান যুগের মুসলমানেরা একদিকে মুসলমান হওয়ার দাবি করে, কিন্তু অপরদিকে ইহুদীদের সম্পর্কে খোদা তা'লা যা কিছু বর্ণনা

শেষাংশ ৯ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ (৩)

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

পুনর্জন্ম সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর একটি উক্তি রয়েছে যা তিনি আর্য সমাজের লালা মুরলীধরনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি বলেন-

"আপনাদের পুনর্জন্ম মতবাদ এর ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে যে, পৃথিবীতে জীবনের যে স্বাভাবিক গতি রয়েছে, সেটি পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিমত্তার কারণে নয়, বা প্রজ্ঞা ও কৌশলের কারণে নয়, বরং পাপীদের পাপ বিভিন্ন প্রকারের বস্তু তৈরী করেছে।.... আপনাদের নীতি অনুসারে আকাশ ও পৃথিবীতে বিচরণরত সমগ্র প্রাণী সত্তা নেহাত সমাপতন বৈ কিছুই না, যেখানে পরমেশ্বরের পরিকল্পনা ও শক্তির বিন্দুমাত্র দখল নেই। ..... যদি না মানুষের আত্মা পাপে লিপ্ত হত, তবে যে কয়েক হাজার প্রজাতির জীবজন্তু পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, সেগুলির একটিও থাকত না। আপনাদের ধারণানুসারে দুষ্কর্মের পরিণামেই আমরা প্রত্যেক প্রকারের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ করে থাকি, আর যাবতীয় পার্থিব কল্যাণ লাভ হওয়ার প্রকৃত কারণ হল এই দুষ্কর্মই। কেউ পাপ করে গাভী হয়ে জন্মালে তবে দুধ খাবেন, আবার কেউ অন্য কোনও দুষ্কর্ম করে ঘোড়া হয়ে জন্মালে আপনি তাতে সওয়ার হতে পারবেন। অনুরূপে কোনও পাপের কারণে গর্ধব, খচ্চর বা উট হয়ে জন্মালে আপনি সেগুলিকে মালবহনের কাজে লাগাতে পারবেন। অতঃপর কেউ যদি এমন বড় কাজ করে যার শাস্তি হিসেবে সে নারী রূপে জন্ম নেয়, তবে আপনার ভাগে জীবন সঙ্গিনী জুটবে। এরপর কেউ যদি পাপের কারণে মারা যায়, তবে সেই আত্মা তার পুত্র বা কন্যা রূপে আপনাকে সন্তান সুখ দিবে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে আপনাদের ধর্মনীতি অনুসারে খোদা তা'লা সৃষ্টির এই ধারা পাপের দ্বারা সঞ্চালিত হচ্ছে।

(সুরমা চশমায়ে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৩)

যদি কেউ ধারণা করে থাকেন যে এমনটি অতীতের মানুষদের ধর্মবিশ্বাস ছিল হয়তো, এখন আধুনিক যুগে এবং নতুন (জ্ঞানের) আলোকের মানুষ এই মতবাদে বিশ্বাসী নয়, তবে তার এই ধারণা ভুল। ২০২০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী গুজরাতের ভুজ শহরে শ্রী সহজানন্দ গুলজার ইনস্টিউট'-এর হস্টেলে থেকে পাঠরতা ৬০জনের বেশি ছাত্রীকে ইনস্টিউটের স্টাফরা অত্যন্ত নীতি-বিগর্হিত ও আপত্তিজনকভাবে পরীক্ষা করে দেখে, যা পুরোপুরি বর্ণনা করা সমীচীন হবে না। তারা দেখতে চাইছিল যে সেই ছাত্রীরা ঋতুমতি নয় তো? এটা এইজন্য করা হয়েছিল, কেননা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে ঋতুমতি ছাত্রীদের অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে বসে খাওয়ার অনুমতি নেই। তাই ছাত্রীদেরকে এজন্য পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল যে তারা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভাঙেনি তো! উক্ত ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, হস্টেল ইনচার্জ এবং একজন কর্মচারীকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয়। এই পটভূমিকায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ধর্মগুরু স্বামী কৃষ্ণস্বরূপ দাস মহাশয় নিজের উপদেশ বাণীতে বলেন-

'একথা নিশ্চিত যে ঋতুমতি অবস্থায় স্বামীদের জন্য খাদ্যপ্রস্তুতকারী মহিলারা পরের জন্মে কুক্কুরনী হয়ে জন্ম নিবে, আর সেই সময় তার হাতে খাদ্য গ্রহণকারী পুরুষরা ষাঁড় রূপে জন্ম নিবে। যদি আমার চিন্তাধারা আপনার পছন্দ না হয়, তবে আমি পরোয়া করি না। কিন্তু এগুলি সবই আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে। "

(হিন্দ সমাচার পত্রিকা, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ এর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

তারা এও বিশ্বাস করে যে, আত্মা এবং শরীর এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অনু-পরমাণু অনাদি ও অনন্ত, খোদা তা'লা এগুলির প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা নন। তাদের বিশ্বাস, সীমিত কর্মের অসীম প্রতিদান পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা কাউকে চির মুক্তি দিতে পারেন না। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষের কোন একটি পাপ অবশ্যই রেখে দেন যাতে পাপের কারণে তিনি তাকে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"বর্তমান বেদের পরিপূর্ণ নির্ভরতা আবাগবন অর্থাৎ পুনর্জন্মের উপর। আর এই পুনর্জন্ম এর দৃষ্টিকোণ থেকে ধরে নিতে হবে যে পৃথিবীর সকল পশুপাখি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয় আর এই পুনর্জন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে চিরন্তন মুক্তিলাভ অসম্ভব বিষয়। আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হবে যে কারোর প্রায়শ্চিত্ত গৃহীত হয় না, পাপের ক্ষমা কোন ক্ষমা নেই। আর বিশ্বাস করতে হবে যে আত্মা খোদা তা'লার সৃষ্ট নয়, বরং সেগুলি সবই খোদার মতই আদি ও অনাদি।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১২৩)

মোটকথা পুনর্জন্ম মতবাদ আল্লাহ্ তা'লার একত্ব, তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু হওয়া, তাঁর অসীম শক্তিমত্তা ও সর্বশক্তিমান হওয়া, এবং তাঁর যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ভ্রান্ত মতবাদটিকে প্রবল আবেগ ও শক্তি দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এর জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত শাহনায়ে হক, সুরমা চশমা আরিয়া, চশমায়ে মারেফাত ইত্যাদি পুস্তকে শাশ্বত সত্য ও তত্ত্বের ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়েছে।

কাদিয়ানের হিন্দুরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কাছে নিদর্শন দেখার দাবি জানাল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কাছে দিব্যবাণী দ্বারা প্রকাশ করলেন যে তাঁর মতবাদের প্রসার হোশিয়ারপুরে হবে। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা যে সমস্ত নিদর্শন দেখতে চাইছে, তা হোশিয়ারপুরে তাঁকে দেওয়া হবে। ১৮৮৬ সালের ২২ শে জানুয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হোশিয়ারপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানে নিভৃতে খোদা তা'লার ইবাদতে মগ্ন থাকেন, যার ফলে খোদা তা'লা তাঁকে এক মহান সংস্কারক লাভ হওয়ার সুসংবাদ দান করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৮৬ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ করেন। তিনি (আ.) হোশিয়ারপুরে থাকাকালীনই আর্যসমাজের সদস্য ও ড্রইং মাস্টার লালা মুরলীধরণ সাহেব নিজে উপস্থিত হয়ে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করার আবেদন করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর সেই আবেদন গ্রহণ করেন, কিন্তু সঙ্গে এও বলেন যে উভয় পক্ষের প্রশ্ন উপস্থাপিত হোক, যাতে কোন ব্যক্তি এই প্রশ্নোত্তর গুলি পড়ে উভয় ধর্মকে যাচাই করার সুযোগ পায়। অতএব উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ১৮৮৬ সালের ১১ ও ১৪ই মার্চ দিন দুটি মোবাহাসা বা তর্কযুদ্ধের জন্য এই শর্তের সাথে নির্ধারিত হল যে চূড়ান্ত উত্তর বা উপসংহার না আসা পর্যন্ত তর্কযুদ্ধ শেষ হবে না।

১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ রাত্রির জলসায় যখন সেই উপসংহারের সময় এল, তখন মাস্টার সাহেব রাত গভীর হওয়ার অজুহাত দিতে থাকলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং অধিকাংশ শ্রোতারা তাঁকে কোনওক্রমে বোঝালেন যে, রাত এমন কিছু বেশি হয় নি, আর এর প্রভাব সকলের উপর একই রকম পড়ছে, কিন্তু মাস্টার সাহেব অনড় ছিলেন। অবশেষে সমস্ত শ্রোতাদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় যে, এই উত্তরটি অবশ্যই লিখিত হওয়া উচিত। মাস্টার মুরলীধরণ যদি এই মুহূর্তে এটি এড়িয়ে যেতে চান, তবে অবশ্যই নিজের পক্ষ থেকে এই উত্তর থেকে পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মুরলীধরণ সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করলেন যে, নিজের পক্ষ থেকে এই উত্তর পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'কিন্তু সেই জলসাতেই তা লিখিত রূপে উপস্থাপিত হওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর বলে মনে হয়, যার কারণে তিনি অবিলম্বে সেখান থেকে উঠে চলে যান। বস্তুত মাস্টার সাহেব এনিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, যদি এই মুহূর্তেই চূড়ান্ত উত্তর দেওয়া হয়, তবে তাকে কতটা লজ্জিত হতে হবে তা খোদাই জানেন।

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) টীকায় লেখেন- 'মিঞা শত্রুঘ্ন সাহেব বেশ কয়েক বার মাস্টার সাহেবের কাছে অনুরোধ অনুযোগ করেন যে আপনি চূড়ান্ত জবাব লিখতে দিন, আমরা সানন্দে বসে থাকব, আমাদের কোনও কষ্ট হবে না, বরং আমরা উত্তর শুনতে উদগ্রীব হয়ে আছি। অনুরূপে আরও কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক এই ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু মাস্টার সাহেব কারো কথা না শুনে গাত্রোত্থান করার কৌশল নেন। "

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫)

অপর জলসার অবস্থাও তথৈবচ ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় তা বর্ণনা করা হল-

'দ্বিতীয় জলসাটি ১৮৮৬ সালের ১৮ই মার্চের দিবসকালে হোশিয়ারপুরের শীর্ষ নেতা শেখ মেহের আলি সাহেবের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম চুক্তি

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.) উহদের যুদ্ধের সময় হযরত সাআদ (রা.) কে বলেছিলেন, ‘ আমার পিতামাতা তোমার প্রতি নিবেদিত হোন, তুমি তির নিক্ষেপ অব্যাহত রাখ। হে বলিষ্ঠ যুবক! তির নিক্ষেপ করতে থাক।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঈমান আনয়নকারী,মক্কায় কষ্ট সহনকারী, নবী করীম (সা.) দেহরক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারী দ্বীনে ইসলাম এবং খিলাফতের প্রতি আত্মাভিমান পোষণকারী অশ্বরোহী বীর যোদ্ধা হযরত সআদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)–এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) পাঁচজন মরহূমীনের উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংনী গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং গায়েবানা জানাযা পড়ান। তাঁরা হলেন,মাননীয় মহম্মদ আকবর বাজওয়া সাহেব (নাযিম তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী, রাবওয়া) এর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া বুশরা আকরম সাহেবা, পীরকুটি জেলার মাননীয় ইকবাল আহমদ নাসের সাহেব, কাশ্মীরের কুটলী জেলার মাননীয় মহম্মদ ইব্রাহিম সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া গোলাম ফাতেমা সাহেবা , মাননীয় মহম্মদ আহমদ আনোয়ার সাহেব হায়দ্রাবাদী এবং মাননীয় সেলিম হোসেন আলযাবি সাহেব (সিরিয়া)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২৪ শে জুলাই , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২৪ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত সা'দ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ, পরিখা, হুদায়বিয়া, খায়বার এবং মক্কা বিজয়সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর দক্ষ তিরন্দাজ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৫)

হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সে গুলোর একটি যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে এক সময় হযরত তালহা (রা.) ও হযরত সা'দ (রা.) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা)

মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন অবস্থায় বের হতাম যে, গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে খাওয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। সেই সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের প্রত্যেকেই উট বা ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় গুটি গুটি মল ত্যাগ করতাম। অর্থাৎ তা পুরোপুরি শক্ত হতো আর একটুও নরম হতো না। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, সেই দিন গুলোতে কাঁটাযুক্ত এক ধরনের লতানো গাছ বাবলার ফল ছিল আমাদের খাবার।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন্নাবী)

হযরত সা'দ (রা.) হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছেন এবং তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পথে তির নিক্ষেপ করেছিলেন আর এটি ছিল হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর যুদ্ধাভিযানের ঘটনা।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব,২য় খণ্ড, পৃ: ৬০৭) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৩)

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয় যা সারিয়া হযরত উবায়দা বিন হারেস নামে খ্যাত। এর উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, (ইতিপূর্বেও আমি এর কিয়দংশ বরং আমার ধারণা এর পুরোটাই বর্ণনা করেছি। তথাপি এখানেও আমি তার বরাতে পুনরায় বর্ণনা করছি।)

রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে তিনি (সা.) তাঁর এক নিকটাত্মীয় উবায়দা বিন হারেস মুত্তালেবী (রা.)-এর নেতৃত্বে ৬০জন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরদের একটি দল প্রেরণ করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কুরাইশদের আক্রমণের সংবাদ সংগ্রহ করা। উবায়দা বিন হারেস (রা.) এবং তার সঙ্গীরা যখন কিছুটা পথ অতিক্রম করে সানিয়াতুল মারআ নামক স্থানে পৌঁছন, তখন তারা অকস্মাৎ দেখতে পান, কুরাইশদের সশস্ত্র কিছু যুবক ইকরামা বিন আবু জাহলের নেতত্বে তাঁবু গেড়ে রেখেছে। [সানিয়াতুল মারআ মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। মদিনায় হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন।] যাহোক, এই উভয় দল পরস্পরের মুখোমুখি হয় আর তাদের মাঝে তির ছোড়াছুড়ির ঘটনাও ঘটে। কিন্তু মুসলমানদের পেছনে কোন সহায়ক বাহিনী লুকিয়ে আছে ভেবে মুশরিকরা মোকাবিলা করা থেকে পিছু হটে আর মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে নি। যাহোক, মুশরিক বাহিনীর দু'জন হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রা.) এবং হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) ইকরামা বিন আবু জাহলের নেতত্বাধীন (বাহিনী) থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়। লেখা আছে যে, সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের সাথে যোগ দিবে– এই উদ্দেশ্যেই তারা কুরাইশদের সাথে বেরিয়েছিলেন। কেননা তারা আন্তরিকভাবে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে কুরাইশদের ভয়ে তাদের জন্য হিজরত করা সম্ভব ছিল না।

(মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৯-১০০)(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৮)

দ্বিতীয় হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে ৮জন মুহাজির সদস্য বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রদলের আমীর নিযুক্ত করে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য খার্‌রারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। খার্‌রার হিজাযে জুহফার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। যাহোক তারা সেখানে যান কিন্তু শত্রুর সাথে তাদের কোন মোকাবিলা হয় নি।

(মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০০)(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৯-৩৩০)

পরবর্তী অভিযানের নাম হলো সরিয়া আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)। এটি দ্বিতীয় হিজরী সনের জামাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানে হযরত সা'দ (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ঘটনার উল্লেখও আমি ইতিপূর্বে একবার করেছিলাম কিন্তু সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের বরাতে এখানেও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

মহানবী (সা.) খুব কাছ থেকে কুরাইশদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যেন তাদের বিষয়ে সব ধরনের প্রয়োজনীয় খবরাখবর যথাসময়ে পাওয়া যায় এবং মদিনা সব ধরনের অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। অতএব এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)আটজন মুহাজিরের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন আর কৌশলগত কারণে এই দলে এমন সব সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন যেন কুরাইশদের গোপন দুরভিসন্ধির খবরাখবর সংগ্রহ করা সহজ হয়। মহানবী (সা.) এই দলের আমীর নিযুক্ত করেন তাঁর ফুপাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-কে। তিনি (সা.) তাদেরকে অভিযানে প্রেরণের সময় উক্ত দলের দলপতিকেও একথা জানান

নি যে, তাদেরকে কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, বরং পথ চলতে চলতে তাদের হাতে একটি খামবন্ধ পত্র প্রদান করেন এবং বলেন, এই পত্রে তোমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তোমরা যখন মদিনা থেকে দু'দিনের পথ অতিক্রম করবে তখন এই পত্র খুলবে এবং তাতে লিপিবদ্ধ নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। যাহোক অবশেষে দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর তারা মহানবী (সা.)-এর নিদের্শনা অর্থাৎ এই পত্র খুলে দেখেন। সেই পত্রে লিখা ছিল, 'তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাবে এবং সেখানে গিয়ে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করবে আর এরপর আমাদেরকে (পরিস্থিতি) সম্পর্কে অবগত করবে।' পত্রের নিচে তিনি (সা.) এ পথনির্দেশও দেন , 'এই অভিযান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তোমার কোন সাথি যদি এই দলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে অনীহা প্রকাশ করে এবং ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিও।' আব্দুল্লাহ্ তার সাথিদেরকে মহানবী (সা.)-এর উক্ত নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত করেন, কিন্তু সবাই এক বাক্যে বলেন, 'আমরা সানন্দে একাজের জন্য প্রস্তুত আছি, আমাদের কেউ ফিরে যাবে না।' এরপর সেই দল নাখলা উপত্যকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

পথিমধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর উট কোথাও হারিয়ে যায় আর তারা তা খুঁজতে খুঁজতে নিজ সাথিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অনেক খুঁজাখুঁজির পরও তাদের পাওয়া যায় নি, ফলে ৮ সদস্যের দলে মাত্র ৬জন অবশিষ্ট থাকে আর তারা সফর অব্যাহত রাখেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এক প্রাচ্যবিদ মিষ্টার মার্গোলিসের উল্লেখপূর্বক লিখেন, সে তার রীতি অনুসারে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে লিখে,

'সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উট ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এই অযুহাত দেখিয়ে পশ্চাতে রয়ে যান। (অথচ) ইসলামের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এসব সাহাবীদের জীবনের প্রতিটি ঘটনা তাদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের সাক্ষ্য প্রদান করে। তাদের একজন বে'রে মঊনার যুদ্ধে কাফেরদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন এবং অপরজন কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে অবশেষে ইরাক-বিজয়ী (সেনা নায়ক) হন; তাঁদের সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করা আর তাও আবার নিছক নিজের কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে তা করা–এটি মিষ্টার মার্গোলিসেরই সাজে। মজার বিষয় হলো, মার্গোলিস সাহেব তার পুস্তকে এ দাবি করেছেন যে, এ পুস্তক আমি সব ধরনের বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে গিয়ে রচনা করেছি।

যাহোক, মুসলমনাদের ক্ষুদ্র এ দলটি নাখলায় পৌঁছে নিজেদের কাজে অর্থাৎ খবরাখবর সংগ্রহের কাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। তাদের কয়েকজন তো গোপনীয়তা রক্ষার্থে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে নেন যাতে পথিকরা তাদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে আগত লোক মনে করে আর কোন ধরনের সন্দেহ না করে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর কিছুটা সময় অতিবাহিত হতে না হতেই, কুরাইশদের ছোট একটি দল আকস্মিকভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা তায়েফ থেকে মক্কায় যাচ্ছিল। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যায় এবং এমন পরিস্থিতির অবতারণা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর আদেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমানরা অবশেষে উক্ত কাফেলার ওপর আক্রমণ করে কাফেলার সদস্যদের বন্দি বা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আক্রমণ করেন যার ফলে কাফেরদের এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং দুজন বন্দি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চতুর্থ ব্যক্তি পালিয়ে যায় আর মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে তাদের পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হয় নি। যাহোক, এরপর মুসলমানরা কাফেলার ধনসম্পদ দখল করে নেয় আর বন্দি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে তারা দ্রুতগতিতে মদিনায় ফিরে আসে। কিন্তু সাহাবীগণ (রা.) কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিলেন–একথা জানার পর মহানবী (সা.) খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, 'মা আমারতুকুম বেকিতালিন ফি শাহ্‌রিল হারাম' অর্থাৎ আমি তো তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দিই নি। তিনি (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতে অস্বীকৃতি জানান। অপরদিকে কুরাইশরাও শোরগোল শুরু করে দিয়ে বলতে থাকে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের পবিত্রতা পদদলিত করেছে। এছাড়া শোরগোলের অন্য কারণ হলো, যে ব্যক্তি মারা গিয়েছিল সে একজন নেতার পুত্র ছিল, নেতার পুত্র নয় বরং সে নিজেই একজন অনেক বড় নেতা ছিল (আর তার নাম ছিল) উমর বিন হাযরামি। যাহোক, ইত্যবসরে কাফিরদের লোকজন তাদের দুই বন্দিকে মুক্ত করার জন্য মদিনায় আসে, কিন্তু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) তখনও ফিরে আসেন নি। তাই মহানবী (সা.) তাদের ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত ছিলেন, কেননা তারা যদি কুরাইশদের হাতে ধরা পড়েন তাহলে তারা তাদেরকে জীবিত ছাড়বে না। এজন্য মহানবী (সা.) তাদের ফিরে আসার পূর্বে বন্দিদের মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমার লোকেরা সুস্থ-সবলভাবে মদিনায় ফিরে এলে তখন আমি তোমাদের লোকদের মুক্ত করে দিব। তারা দুজন ফিরে এলে মহানবী (সা.) উভয় বন্দিকেই মুক্ত করে দেন। এই দুই বন্দির একজনের ওপর মদিনায় অবস্থানের এমন গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং বে'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৩০-৩৩৪)

বদরের যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়েও হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন, মহানবী (সা.) দ্রুতগতিতে বদর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন আর বদরের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি (সা.) কিছু চিন্তা করে, যার কথা রেওয়ায়েতে উল্লেখ নেই, হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের বাহনে বসিয়ে ইসলামী সেনাদলকে পিছনে রেখে কিছুটা সামনে এগিয়ে যান। তখন পথে তাঁর সাথে এক বৃদ্ধ বেদুইনের সাক্ষাৎ হয়, যার সাথে কথায় কথায় তিনি (সা.) জানতে পারেন যে, কুরাইশদের সেনাদল বদর প্রান্তরের খুব কাছে অবস্থান করছে। মহানবী (সা.) এ সংবাদ শুনে ফিরে আসেন। এরপর হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আল-আওয়াম (রা.) এবং সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। তারা বদর প্রান্তরে পৌঁছানোর পর হঠাৎ দেখতে পান মক্কার কয়েকজন লোক একটি জলাধার থেকে পানি নিচ্ছে। সেই সাহাবীরা (রা.) এই দলের ওপর আক্রমণ করে এক হাবসী দাসকে গ্রেফতার করে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাকে অত্যন্ত কোমল সুরে জিজ্ঞেস করেন, সেনাবাহিনী এখন কোথায় অবস্থান করছে? উত্তরে সে বলে, সামনের টিলার পিছনে। তিনি (সা.) আবার জিজ্ঞেস করেন, বাহিনীতে লোক সংখ্যা কত? সে উত্তর দেয়, অনেক, কিন্তু সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এটা বল যে, তাদের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবাই করা হয়? সে বলে, দশটি। তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, মনে হচ্ছে এই সৈন্যদলে এক হাজার লোক রয়েছে। বাস্তবে তারা এত সংখ্যকই ছিল। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৫৫-৩৫৬)

সম্ভবত এ ঘটনাটিও আমি পূর্বেও বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দের বীরত্বের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও অশ্বারোহীর মতো বীর-বিক্রমে লড়াই করছিলেন। (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৪)

এ কারণেই হযরত সা'দকে 'ফারিসুল ইসলাম' অর্থাৎ 'ইসলামের অশ্বারোহী' বলা হতো। (উমদাতুল ক্বারী, শারাহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৫)

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন যারা চরম অনিশ্চয়তার মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট দৃঢ়-অবিচল ছিলেন।

(খুতবাতে তাহের, খিলাফত লাভের পূর্বে জলসা সালানার বক্তব্য, ১৯৭৯)

উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের ভাই উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস, যে কিনা মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর আক্রমণও করেছিল; এ ঘটনাটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার এক বক্তৃতায় এভাবে বর্ণনা করেন যে, উতবা সেই হতভাগা ব্যক্তি ছিল যে ভয়াবহ আক্রমণ করে হযরত আক্বদাস মুহাম্মদ মুস্তফা(সা.)-এর নিচের পাটির দু'টি পবিত্র দাঁত শহীদ করে এবং তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল ভয়ংকরভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। উতবার ভাই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস মুসলমানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যখন উতবার দুর্ভাগা আচরণ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন প্রতিশোধের নেশায় তার রক্ত টগবগ করতে থাকে। তিনি বলেন, আমি নিজ ভাইকে হত্যা করতে এত বেশি উদ্‌গ্রীব ছিলাম যে, সম্ভবত

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

ইতিপূর্বে কখনোই আমি অন্য কোন জিনিসের জন্য এমন উদগ্রীব হই নি। সেই সীমালঙ্ঘনকারীর সন্ধানে আমি দুবার শত্রুব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ি যেন নিজের হাতে তাকে টুকরো টুকরো করে আমার মনটাকে শান্ত করতে পারি। কিন্তু আমাকে দেখে বারবার সে এমনভাবে কেটে পড়ে, যেভাবে শেয়াল লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। অবশেষে আমি যখন তৃতীয়বার এভাবে (শত্রুদের মাঝে) ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিলাম তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্নেহভরে আমাকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার কি জীবনটা খোয়ানোর ইচ্ছে হচ্ছে? তাই আমি হুযূর (সা.)-এর বাধার মুখে এ সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হই।

(খুতবাতে তাহের, খিলাফত লাভের পূর্বে জলসা সালানার বক্তব্য, ১৯৭৯)

উহুদের যুদ্ধের দিন যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে দৃঢ়-অবিচল সাহাবী মাত্র কয়েকজন বাকি ছিলেন, সেই সময় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের অবস্থা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এভাবে লিখেছেন যে,মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের হাতে তির ধরিয়ে দেন আর সা'দ লাগাতার শত্রুকে লক্ষ্য করে তির ছুঁড়তে থাকেন। একবার মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তুমি লাগাতার তির নিক্ষেপ করে যাও। সা'দ জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত এ শব্দগুলো অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৫)

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেনযে, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন তূণথেকে তির বের করে আমার সামনে রেখে দেন এবং বলেন তির চালাও, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত হোন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০৫৫)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ছাড়া অন্য কারো জন্য তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করার দোয়া দিতে শুনিনি। তিনি হযরত সা'দকে উহুদের যুদ্ধের দিন বলেন তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তির চালাও হে শক্তিশালী যুবক!তির চালাও।

(জামে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৫৩)

এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, হযরত সা'দ ছাড়া হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের কথাও উল্লেখ হয়েছে যাকে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **'ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি'** অর্থাৎ, তোমার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৭২০)

উহুদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সা'দ বলেন, উহুদের দিন মহানবী (সা.) তার জন্য নিজের পিতামাতাকে একত্রিত করেন। তিনি (রা.) বলেন, মুশরিকদের মাঝে এক ব্যক্তি ছিল, যে মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। মহানবী (সা.) তাকে অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, তির নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, (এ কথা শুনে) আমি ফলাবিহীন একটি তির তার পার্শ্ব বরাবর নিক্ষেপ করি যার ফলে সে নিহত হয় এবং তার লজ্জা স্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে। আর আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) আনন্দে হেসে ফেলেন। (সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-২৪১২)

আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই মুশরিক, ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে যার নাম হিব্বান বলা হয়েছে, একটি তির নিক্ষেপ করে যা হযরত উম্মে আয়মানের আঁচলে গিয়ে লাগে যখন কিনা তিনি আহতদের পানি পান করানোয় ব্যস্ত ছিলেন। এটি দেখে হিব্বান হাসতে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে একটি তির দেন যা হিব্বানের কণ্ঠনালীতে গিয়ে লাগে এবং সে পিছন দিকে পড়ে যায়, যার ফলে তার নগ্নতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এতে মহানবী (সা.) মুচকি হাসেন। (আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪)

যুগ খলীফার বাণী

আজ প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল পৃথিবীবাসীকে অবগত করা যে ধর্ম কি? আমাদের অধিকার সমূহ কি এবং আমাদের দায়িত্বাবলী কি?

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২০১৯ সাল, জার্মানী)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

সহীহ্ মুসলিম শরীফের যে হাদীসটি এই মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে, আমাদের জামা'তের নূর ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনুদিত এ হাদীসের অধীনে একটি নোট লেখা হয়েছে আর এটি খুব ভালো নোট। অর্থাৎ মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি এমন একটি তিরের মাধ্যমে এক ভয়ঙ্কর শত্রুর জীবনাবসান ঘটিয়েছেন যার ফলাও ছিল না।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-২৪১২)

অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রা.) এক হাজার তির নিক্ষেপ করেছিলেন।

(রওশন সিতারে, গোলাম বারী সাইফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১)

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে সাক্ষী হিসেবে যেসব সাহাবী সন্ধিপত্রে সাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের তিনটি পতাকার মধ্যে একটি পতাকা ছিল হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাতে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৫)

বিদায় হজ্জের সময় হযরত সা'দ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত সা'দ বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাই। মহানবী (সা.) শুশ্রূষার জন্য আমার কাছে আসেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার অনেক ধনসম্পদ রয়েছে আর আমার উত্তরাধিকারী কেবল আমার একমাত্র কন্যা। তাই আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ ধন-সম্পদ সদকা করে দিব? তিনি (সা.) বলেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তাহলে কি অর্ধেক সম্পদ সদকা হিসেবে দিয়ে দিব? মহানবী (সা.) বলেন, না। আমি নিবেদন করলাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করে দিই? তখন মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, কিন্তু এটিও অনেক বেশি। অতঃপর তিনি (সা.)বলেন, তুমি তোমার সন্তানদেরকে সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে রিক্ত-হস্ত রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, পাছে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে থাকবে। আর তুমি যা-ই খরচ করবে তার বিনিময়ে প্রতিদান পাবে, এমনকি অন্নের সেই গ্রাসের জন্যও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি স্বীয় হিজরতের ক্ষেত্রে পিছনে থেকে যাব? তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি পিছনে থেকেও যাও তবুও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য তুমি যে আমল করবে তাতে তোমার সম্মান ও পদমর্যাদা উন্নীত হবে। আর আমি আশা রাখি যে, তুমি আমার পরেও জীবিত থাকবে (অর্থাৎ একইসাথে এই প্রত্যাশাও তিনি ব্যক্ত করেন), এমনকি জাতিসমূহ তোমার মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হবে এবং কিছু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস-৬৭৩৩)

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীদের হিজরতকে তাদের জন্য পূর্ণতা দাও আর তুমি তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিও না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৯৫)

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি অসুস্থ হলে মহানবী (সা.) আমার শুশ্রূষার জন্য আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ওসীয়্যত করেছ? আমি নিবেদন করলাম, জ্বী হুযূর। মহানবী (সা.) বলেন, কতটা করেছ? আমি বললাম, আমি আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তোমার সন্তানদের জন্য কী রেখেছ? আমি নিবেদন করলাম, তারা সম্পদশালী। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তাহলে এক দশমাংশ ওসিয়্যত কর। হযরত সা'দ বলেন, আমি এভাবেই বলতে থাকি আর তিনি (সা.) সেভাবেই বলতে থাকেন। অর্থাৎ হযরত সা'দ বেশি সম্পদ সদকা করতে চাচ্ছিলেন আর মহানবী (সা.) তাকে কম করতে বলছিলেন। অবশেষে মহানবী (সা.) বলেন, এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ওসিয়্যত কর, আর এক তৃতীয়াংশও অনেক বেশি। (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস-৩৬৬১)

যাহোক, জ্ঞানী ও ফিকাহ বিদগণ এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এ যুক্তি দেন যে, এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের ওসিয়্যত হতে পারে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন-

"হাদীস সমূহও একথা সমর্থন করে যে, নিজের প্রয়োজনীয় খরচাদি রেখে বাকি সব সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া ইসলামী শিক্ষা নয়। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন,

يَجِيْءُ اَحَدُكُمْ بِمَالِهٖ كُلِّهٖ يَتَصَدَّقُ بِهٖ وَيَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ اِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى -

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তাদের সমুদয় সম্পদ সদকার করার জন্য নিয়ে আসে,অতঃপর মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতে। সদকা কেবল অতিরিক্ত সম্পদ থেকে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন, إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ অর্থাৎ তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাও তাহলে তা তাদেরকে নিঃস্ব বা দরিদ্র রেখে যাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম,পাছে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে থাকবে। অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) মহানবী (সা.) এর কাছে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে নিষেধ করেন। এরপর তিনি অর্ধেক সম্পদ দান করতে চাইলে তিনি (স.) এটি করতেও নিষেধ করেন। এরপর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি (সা.) এ পরিমাণ সম্পদ দান করার অনুমতি দেন, কিন্তু একই সাথে তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, এক তৃতীয়াংশ ওসিয়্যত কর, যদিও তৃতীয়াংশও অনেক বেশি, 'আস্‌সুলুসু ওয়াস্‌ সুলুসু কাসির'। মোটকথা এ ধারনা যে, ইসলামের আদেশ হলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব সম্পদ দান করে দেওয়া উচিত– এটি সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী এবং সাহাবীদের রীতি পরিপন্থী, কেননা সাহাবীদের কতক এরূপ ছিলেন যাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের উত্তরাধীকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ; ৪৯৪)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, আমি মক্কায় অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার শুশ্রূষার জন্য আসেন এবং তিনি (সা.) আমার বুকে হাত রাখেন। তখন আমি আমার হৃদয়ে তাঁর (সা.) হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি (সা.) হাত রেখে আমাকে বলেন, তোমার তো হৃৎরোগ রয়েছে, তাই তুমি হারিস বিন কালাদার কাছে যাও, যে বনু সাকিফ গোত্রের ভাই। সে একজন চিকিৎসক। তাকে গিয়ে বল, সে যেন মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর আঁটিসহ চূর্ণ করে এবং তোমাকে ঔষধ স্বরূপ পান করায়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সা'দের দেখাশুনা করার জন্য মক্কায় এক ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সা.) তাকে বিশেষভাবে তাগিদ করেন যে, যদি হযরত সা'দ মক্কায় মৃত্যু বরণ করেন তবে তাকে যেন কিছুতেই মক্কায় দাফন করা না হয়, বরং মদিনায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।

(তাবকাত,ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত সা'দ-এর শিকার সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যদিও নিজে শিকার করতেন না, কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি শিকার করাতেন। যেমন এক যুদ্ধাভিযানে তিনি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে ডাকেন এবং বলেন, ঐ যে দেখ! হরিণ যাচ্ছে, ওটাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ কর। তিনি যখন তির নিক্ষেপ করতে উদ্যত হন তখন তিনি (সা.) স্নেহের সাথে নিজের চিবুক তার (রা.) কাঁধে রাখেন এবং বলেন, হে খোদা! তার তির যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়। (তফসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৪)

হযরত সা'দকে আল্লাহ্ তা'লা এ সৌভাগ্যও দান করেছিলেন যে, ইরাক তাঁর (রা.) হাতে বিজিত হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধের সময় একবার সাহাবীগণ মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, পরিখায় একটি পাথর প্রতিবন্ধক হয়েছে, যা ভাঙা যাচ্ছে না। হুযূর (সা.) সেখানে উপস্থিত হন এবং কোদাল দ্বারা সেই পাথরে ওপর তিনটি আঘাত করেন। প্রত্যেকবার পাথর কিছুটা করে ভেঙে যায় আর মহানবী (সা.) উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলেন এবং তাঁর অনুসরণে সাহাবীরাও তকবীর উচ্চকিত করেন। সেই সময় একবার কোদাল মেরে তিনি (সা.) বলেন, আমাকে মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদ গুলোর পতন দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.) যা দেখেছিলেন তা হযরত সা'দের (রা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পায়।

আরবের (বিভিন্ন অংশে) দুটি বড় বড় শক্তি ছিল; একটি কিসরা (পারস্য), অপরটি কায়সার (কন্সটান্টিনোপল)। ইরাকের বড় অংশ পারস্যের অধীনস্ত ছিল এবং মিদিয়ানে তাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। মাদায়েন, কাদসিয়া, নাহাওয়ান্দ এবং জলুলার বিখ্যাত যুদ্ধ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

(রওশন সিতারে, রচনা-গোলাম বারী সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯)

মিদিয়ানের পরিচয় হলো-এটি ইরাকের বাগদাদ থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণ দিকে দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত। যেহেতু এখানে একের পর এক বেশ কয়েকটি শহর গড়ে উঠেছিল এজন্য আরবরা এটিকে মাদায়েন অর্থাৎ কয়েকটি শহরের সমষ্টি বলা আরম্ভ করে।

কাদসিয়া-ও ইরাকের একটি শহর ছিল যেখানে মুসলমান এবং পারস্যবাসীদের মাঝে বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেটিকে কাদসিয়ার যুদ্ধ বলা হয়। বর্তমান কাদসিয়া শহরটি কুফা থেকে পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত।

নাহাওয়ান্দ বর্তমান ইরানে অবস্থিত একটি শহর যা ইরানের হামদান প্রদেশে অবস্থিত এর রাজধানী হামদান থেকে সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

জলুলা বর্তমান ইরাকের একটি শহর যা দাজলাতুল আয়মান নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মুসলমান এবং পারস্যবাসীদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল। এর নাম জলুলা এজন্য রাখা হয়েছিল যে, এ শহরটি ইরানীদের লাশে ভরে গিয়েছিল।

হযরত আবু বকরের যুগে ইরানীদের বার বার সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করার দরুণ হযরত মুসান্না বিন হারেসা ইরাকে অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত আবু বকর তাকে অনুমতি প্রদান করেন আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে (রা.) একটি বড় সেনাবাহিনীসহ তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। সিরিয়া থেকে যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) খিলাফতের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদকে (রা.) তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইরাকে হযরত মুসান্নাকে (রা.) নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। কিন্তু হযরত খালেদের (রা.) ইরাক থেকে চলে যেতেই এই অভিযান নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হযরত উমর (রা.) যখন খলীফা হন তখন তিনি নুতনভাবে ইরাকের অভিযানের দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। হযরত মুসান্না (রা.) বুআয়েব এবং অন্যান্য যুদ্ধে শত্রুদেরকে বারংবার পরাজিত করে ইরাকের একটি বিস্তীর্ণঅঞ্চল দখল করে নেন। তখন ইরাক পারস্য সম্রাটের অধীনস্ত ছিল। ইরানীরা যখন মুসলমানদের রণদক্ষতা আঁচ করতে পারে এবং তাদের ক্রমাগত বিজয় ইরানীদের চোখ খুলে দেয়; তখন তারা বুরান দুখ্‌ত নামের একজন মহিলা, যে তাদের সম্রাজ্ঞী ছিল; তার পরিবর্তে কিসরার বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ইয়াযদজার্‌দকে সিংহাসনে আসীন করায়। সে সিংহাসনে আরোহন করেই ইরানী সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে সুসংহত করে। পুরো দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত করে। এমন পরিস্থিতিতে হযরত মুসান্নাকে (রা.) বাধ্য হয়ে আরবের সীমান্ত থেকে সরে যেতে হয়। হযরত উমর (রা.) যখন এসব ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি আরবের সর্বত্র দক্ষ বক্তাদের প্রেরণ করেন এবং কিসরার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। ফলে আরবে এক উচ্ছ্বাস ও উদ্যম সৃষ্টি হয় এবং চতুর্দিক থেকে ইসলামের ভালোবাসায় নিবেদিত ব্যক্তিরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাজধানীর দিকে ছুটে আসে। হযরত উমর (রা.) এ অভিযানের নেতৃত্ব কার কাছে সোপর্দ করা যায়– সে বিষয়ে পরামর্শ করেন। সর্বসাধারণের পরামর্শক্রমে হযরত উমর (রা.) নিজেই এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তুত হন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মতামত তাতে প্রতিবন্ধক হয়, অর্থাৎ তারা এতে বাধা দেন। এর জন্য হযরত সাঈদ বিন যায়েদের নামও উপস্থাপন করা হয়। এরই মাঝে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য আমি সঠিক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, তিনি কে? হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, তিনি হলেন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। অতঃপর সবাই হযরত সা'দ (রা.)-এর পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন আর হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কে বলেন-অর্থাৎ তিনি একজন অত্যন্ত বীর, নির্ভীক এবং শক্তিশালী তিরন্দায ব্যক্তি। হযরত মুসান্না কুফা এবং ওয়াসেত এর মধ্যবর্তী যি-কার নামক স্থানে আট হাজার নিবেদিত প্রাণ সাহসী যোদ্ধার সাথে হযরত সা'দের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসলে তাঁর মৃত্যু হয় আর তিনি তাঁর ভাই হযরত মুআন্নাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হযরত মুআন্না দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত সা'দ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হযরত মুসান্নার সংবাদ পৌঁছে দেন। হযরত সা'দ তাঁর সৈন্যদের হিসাব নিয়ে দেখেন যে, এটি প্রায় ত্রিশ হাজার সৈনিকের বাহিনী। তিনি সৈন্যদলকে বিন্যস্ত করেন আর সৈন্যদের ডান ও বাম অংশে বন্টন করে তাদের জন্য পৃথক পৃথক নেতা নিযুক্ত করেন এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়ে কাদসিয়াকে ঘেরাও করেন। কাদসিয়ার অভিযান ১৬ হিজরী সনের শেষের দিকে হয়। এতে কাফেরদের সংখ্যা দুই লাখ আশি হাজারের কাছাকাছি ছিল আর এই সৈন্যদলের মাঝে ত্রিশটি হাতি ছিল। ইরানী বাহিনীর

নেতৃত্ব রুস্তমের হাতে ছিল। হযরত সা'দ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান আর এর জন্য তিনি হযরত মুগীরা বিন শু'বাকে প্রেরণ করেন। রুস্তম তাকে বলে যে, তোমরা হলে কপর্দকহীন আর এই দারিদ্রতা ঘোচানোর জন্য তোমরা এসব করছ। আমরা তোমাদের এত দিব যে, তোমাদের পেট ভরে যাবে। হযরত মুগীরা উত্তরে বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছি, আমরা তোমাদেরকে এক খোদা তা'লার প্রতি এবং তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি তোমরা এটি গ্রহণ কর তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। তা না হলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে এবং তরবারি আমাদের ও তোমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এই উত্তরে রুস্তম-এর চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। সূচনা তাদের পক্ষ থেকে হয় এবং তারা যুদ্ধ করতে চাইছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমরা এখনও যুদ্ধ করতে চাই না, বরং আমরা তোমাদেরকে ইসলামের তবলীগ করছি, ইসলামের সংবাদ দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা যদি যুদ্ধ কামনা কর তাহলে ঠিক আছে, তরবারি-ই এর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। যাহোক তার চেহারা রক্তিম হয়ে যায় আর সে যেহেতু মুশরিক ছিল তাই সে অনুসারে বলে, চন্দ্র ও সূর্যের কসম, সকাল হওয়ার পূর্বেই আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করব এবং তোমাদের সবাইকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। হযরত মুগীরা বলেন, لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ । সকল শক্তির উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু হলেন আল্লাহ্‌ তা'লা, আর একথা বলে তিনি নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন। হযরত সা'দ হযরত উমরের বার্তা লাভ করেন যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের তবলীগ কর। অতএব হযরত সা'দ বিখ্যাত কবি এবং অশ্বারোহী হযরত উমর বিন মাদি কারিব এবং হযরত আশআস বিন কায়েস কিন্দিকে এই প্রতিনিধি দলের সাথে প্রেরণ করেন। রুস্তমের সাথে তাদের দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দেন, 'তোমাদের গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।' তখন রুস্তম এবং তাঁর মাঝে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দলের লোকেরা বলেন, 'আমাদের নবী (সা.) আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা তোমাদের এলাকা জয় করব।' একথা শুনে রুস্তম মাটির ঝুড়ি আনার নির্দেশ দেয় এবং বলে, 'নাও, এটি আমাদের ভূমি, এটিকে মাথায় তুলে নাও।' হযরত উমর বিন মাদি কারিব দ্রুত উঠেন এবং মাটির ঝুড়ি নিজের ঝুলিতে রেখে রওয়ানা হয়ে যান আর বলেন, 'এটি একথার পূর্বলক্ষণ যে, আমরা বিজয়ী হব এবং তাদের ভূমি আমাদের করতলগত হবে।' তারপর তিনি ইরানের বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। এতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয় এবং বলে, 'আমার দরবার থেকে বেরিয়ে যাও। তোমরা যদি দূত না হতে, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যার আদেশ দিতাম।' এরপর সে রুস্তমকে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার যোহরের নামাযের পর যুদ্ধের ঢাক বেজে উঠে। হযরত সা'দ তিনবার উচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন আর চতুর্থবারে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হযরত সা'দ অসুস্থ ছিলেন এবং রণক্ষেত্রের নিকটবর্তী উজাইব দুর্গের বালাখানায় বসে সৈন্যদলকে দিকনির্দেশনা প্রদান করছিলেন।

(রওশন সিতারে,রচনা গোলাম বারী সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯-৮২)

এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে খসরু পারভেযের পৌত্র ইয়াযদজার্‌দ এর সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর ইরাকে বৃহৎ পরিসরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন হযরত উমর তাদের মোকাবিলার জন্য হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ যুদ্ধের জন্য কাদসিয়ার ময়দানকে বেছে নেন এবং হযরত উমরকে এই রণক্ষেত্রের একটি নকশা প্রেরণ করেন। হযরত উমর এই স্থানটিকে পছন্দ করেন, কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও লিখেন যে, 'ইরানের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে তোমার জন্য আবশ্যক হলো, ইরানের বাদশাহ্‌র নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো।' অতএব এই আদেশ লাভ করে তিনি একটি প্রতিনিধি দলকে ইয়াযদজার্‌দ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরণ করেন। যখন এই প্রতিনিধি দল ইরানের বাদশাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়, ইরানের বাদশাহ্‌তার অনুবাদককে বলে, 'এদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, এরা এখানে কেন এসেছে?' তার এই প্রশ্ন শুনে প্রতিনিধি দলের প্রধান হযরত নো'মান বিন মুকার্‌রিন উঠে দাঁড়ান এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সংবাদ প্রদান করে বলেন, 'তিনি (সা.) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ করি এবং পুরো বিশ্বকে সত্যধর্মে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতি আহ্বান জানাই। এ আদেশ অনুযায়ী আমরা আপনার কাছে এসেছি এবং আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।' ইয়াযদজার্‌দ এই উত্তরে চরম ক্রুদ্ধ হয় এবং বলে, 'তোমরা এক বর্বর এবং মৃত ভক্ষণকারী জাতি। তোমাদেরকে যদি ক্ষুধা এবং দারিদ্র এ আক্রমণের জন্য বাধ্য করে থাকে তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে এত পরিমাণ পানাহার সামগ্রী দিতে প্রস্তুত আছি যে, তোমরা শান্তিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।' অথচ সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল আর এরপর অপবাদও সে মুসলমানদেরকেই দিচ্ছিল। যাহোক, এরপর সে বলে, 'একইভাবে তোমাদেরকে পরিধানের জন্য পোশাকও দিব। তোমরা এ গুলো নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাও।' অর্থাৎ এখানে সীমান্তসমূহে বসে থেকে নিজেদের সীমানা পাহারা দেওয়া পরিত্যাগ কর আর আমি যেমনটি চাচ্ছি আমাকে এই এলাকা দখল করতে দাও। তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে কেন নিজেদের জীবননাশ করতে চাও? যখন সে তার কথা শেষ করল, তখন ইসলামি প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে হযরত মুগীরা বিন যুরারাহ দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, 'আপনি আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। আমরা প্রকৃতপক্ষেই এক বর্বর এবং মৃত ভক্ষণকারী জাতি ছিলাম। সাপ, বিছে, পঙ্গপাল ও টিকটিকি পর্যন্ত খেয়ে ফেলতাম, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল (সা.)-কে আমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তার কথার উপর আমল করেছি। যার ফলে এখন আমাদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে আর আমাদের মাঝে সেসব মন্দ বিষয় বিদ্যমান নেই যে গুলোর উল্লেখ আপনি করেছেন। এখন আমরা কোনভাবে প্রলুব্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন সিদ্ধান্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হবে। পার্থিব অর্থ-সম্পদের লালসা আমাদেরকে আমাদের সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারবে না।' ইয়াযদজার্‌দ এ কথা শুনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয় এবং এক ভৃত্যকে ডেকে বলে, যাও মাটির একটি বস্তা নিয়ে আস। মাটির বস্তা নিয়ে আসা হলে সে ইসলামী প্রতিনিধিদলের নেতাকে সামনে ডাকে এবং বলে, 'যেহেতু তোমরা আমার প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করেছ তাই এখন মাটির এ বস্তা ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না।' সেই সাহাবী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে অগ্রসর হন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির বস্তা পিঠে নিয়ে লাফ দিয়ে দ্রুত দরবার থেকে বেরিয়ে উচ্চ স্বরে নিজের সঙ্গীদের বলেন, 'আজকে ইরানের বাদশা নিজ হাতে নিজের দেশের মাটি আমাদের হাতে সোপর্দ করেছে।' একথা বলে ঘোড়ায় চড়ে তিনি দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করেন। বাদশাহ্‌ তাঁর এই স্লোগান শুনে কেঁপে উঠে আর তার সভাসদদের দৌড়ে গিয়ে তার কাছ থেকে মাটির বস্তা ফিরিয়ে আনতে বলে, কেননা এটি খুবই অশুভ লক্ষণ যে, 'আমি নিজ হাতে আমার দেশের মাটি তাদের হাতে তুলে দিয়েছি।' কিন্তু ততক্ষণে তিনি ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। অবশেষে তাই হয় যা তিনি বলেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো ইরান মুসলমানদের করায়ত্বে চলে আসে। মুসলমানদের মাঝে এই মহা বিপ্লব কীভাবে সৃষ্টি হলো? কুরআনী শিক্ষা তাদের চরিত্র ও অভ্যাসে এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল যা তাদের হীন জীবনের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেছিল আর তাদেরকে উন্নত নৈতিক চরিত্রে উপনীত করেছিল। আর এর ফলে তারা জগতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারের ভূমিকা পালন করেন আর ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা-ই তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানিয়েছে। কোন ভয়-ভীতি বা কোন প্রকার শক্তি তাদেরকে ভীত করতে পারে নি।

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২০৪-২০৫)

যাহোক, তাঁর স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখনও বাকি আছে তা পরবর্তীতে উপস্থাপন করব, ইনশাআল্লাহ্‌। আজও আমি কয়েকজন ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। তাদের মধ্য থেকে প্রথম জানাযাটি হলো, মোহতরমা বুশরা আক্রাম সাহেবার। তিনি পাকিস্তানের নাযের তালীমুল কুরআন ওয়াকফে আরযী মুহাম্মদ আক্রাম বাজওয়া সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ২৫শে মার্চ ৬৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে তখন জানাযা পড়ানো হয় নি। তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে ওসীয়্যত করেছিলেন। তার সন্তানাদির মাঝে রয়েছে দুই পুত্র ও এক কন্যা। বুশরা আক্রাম সাহেবা তার স্বামী জনাব আক্রাম বাজওয়া সাহেবের সাথে ১৫ বছর লাইবেরিয়াতে বসবাস করেন। তখন তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ লাইবেরিয়ার সদর হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। লাইবেরিয়াতে

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

গৃহযুদ্ধের সময় তার স্বামী-সন্তানসহ পনের দিন পর্যন্ত তাকে সেনাব্যারাকে অবরুদ্ধ রাখা হয়। মুহাম্মদ আক্রাম বাজওয়া সাহেব লিখেন, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততার সাথে দীর্ঘ ৩৭ বছর একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর (অর্থাৎ তার) সঙ্গ দিয়েছেন। বিশেষ করে আমার যখন মুবাল্লেগ হিসেবে লাইবেরিয়াতে নিযুক্তি হয়,(সেখানে তিনি জামা'তের আমীরও ছিলেন) সেখানে দীর্ঘ ২৩ বছর অব স্থানকালে তবলীগি ও তরবিয়তি কার্যক্রমেও মরহুমা সহযোগিতা করেছেন। অতিথি আপ্যায়নসহ জামা'তের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সহযোগী ছিলেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবেও কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৫ বছর যাবৎ লাইবেরিয়াতে অব স্থানকালে তিনি বেশ কয়েকবার ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডে আক্রান্ত হন,কিন্তু তা সত্ত্বেও নিতান্ত ধৈর্য সহকারে আমার সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের নিরিখে অতি উত্তমভাবে সন্তানদের তরবিয়ত করেছেন। তার দুই সন্তান মাশাআল্লাহ্‌ অত্যন্ত বিশ্ব স্ততা সহকারে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। সেখানকার স্কুলের প্রিন্সিপাল ওয়াকফে জিন্দেগী মনসুর নাসের সাহেব লিখেন, লাইবেরিয়াতে আমি যখন একা ছিলাম তখন তিনি টানা তিন বছর আমাকে নিজের বাড়িতে রেখে আতিথেয়তা করেছেন এবং নিজ সন্তানের মতো বা ছোট ভাইয়ের মতো করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তার সন্তানদেরও তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন এবং মরহুমার পুণ্যকর্ম সমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্‌ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার করুন। দ্বিতীয় জানাযা হলো ইকবাল আহমদ নাসের পীরকোটি সাহেবের। তিনি ক্রুণ্ডি জেলার অন্তর্গত ক্ষেরপুর নিবাসী ছিলেন। তিনি গত ১৪ জুলাই ২০২০ তারিখে ৮২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'** তার পুত্র আকবর আহমদ তাহের সাহেব বুর্কিনা ফাসোতে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি লিখেন যে, তিনি হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিয়া নূর মুহাম্মদ রফিক সাহেবের পুত্র ছিলেন। সেই সাথে হযরত মসীহ্‌ মওউদ(আ.) এর সাহাবী মিয়া ইমামদ্বীন সাহেবের পৌত্র এবং হযরত মসীহ্‌ মওউদ(আ.)-এর সাহাবী মিয়া পীর মুহাম্মদ সাহেব ও মোকাররম হাফেজ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের ভাইপো ছিলেন। জামা'তী কাজে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। দীর্ঘকাল সেক্রেটারী মাল হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম ছিলেন, ইমামুস সালাত ছিলেন, মুরব্বী আতফাল হিসেবেও তিনি দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন, শৈশবে আমি দেখেছি যে, তিনি একটি বাক্সে আলাদা করে পয়সা রেখে দিতেন আর জিজ্ঞেস করলে বলতেন চাঁদার টাকা আমি পৃথক করে রেখে দিই যেন সময়মতো চাঁদা দিতে পারি। তিনি খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তবলীগ করতেন। তার মাধ্যমে অনেক সৎ প্রকৃতির মানুষ আহমদী হয়েছেন। তিনি দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন, নিয়মিত নামায, রোযা ও তাহাজ্জুদ নামাযে অভস্ত ছিলেন। তিনি কিছু দিন বুর্কিনা ফাসোতে ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ২০১৬ সালে তিনি বুর্কিনা ফাসোতে আসেন। সেই দিন গুলোতে জামা'তী যত জলসা ও ইজতেমা হয়েছে সে গুলোতে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন এবং খুবই আবেগের সাথে উচ্চ স্বরে 'নারা' উচ্চকিত করতেন। উপস্থিত লোকদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেন এবং নিজেও প্রশান্তি লাভ করেন, কেননা পাকিস্তানে দীর্ঘদিন জলসা না হওয়ার কারণে তাঁর হৃদয়ের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবার হিসেবে স্ত্রী বশীরা বেগম সাহেবা এবং তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। বুর্কিনা ফাসোর আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন যে,যখন তিনি বুর্কিনা ফাসোতে আসেন,যদিও ভাষা জানতেন না, সেখানে ফ্রেঞ্চ ভাষা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তার ভালোবাসার ভাষা সবাই বুঝতো আর তিনি সকলের সাথে এতটা আন্তরিকতার সাথে মিশতেন যে, তার আন্তরিকতার কারণে সবাই তাকে পছন্দ করত। তার মৃত্যুতে স্থানীয়রা খুবই আন্তরিকতার সাথে তার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি লিখেন, তার মৃত্যুর পর আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত বাপিনা সাহেব তার ছবি শেয়ার করেন এবং লিখেন যে, বুর্কিনা ফাসোতে অবস্থানকালে তার সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাকে আমি একজন খাঁটি এবং মহান আহমদী হিসেবে পেয়েছি। আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা এবং অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার দোয়ার উত্তারাধিকারী করুন। বুর্কিনা ফাসোতে কর্মরত তারমুরব্বী পুত্র জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তৃতীয় জানাযা হলো গোলাম ফাতেমা ফাহ্‌মিদা সাহেবার। তিনি মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি আজাদ কাশ্মীরের কোটলির দুলিয়া জাট্টার বাসিন্দা ছিলেন। ২০২০ সালের ১৮জুলাই তারিখে বাহাত্তর বছর বয়সে দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। ১৯৪৪ সনে তার পিতা বয়আত করেছিলেন, যার নাম ছিল নেক মুহাম্মদ উরফ্‌ কালে খান। বয়আতের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমি কোন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। যখন আমি সেই বুযুর্গকে দেখলাম তখন আমি দৌড়ে গিয়ে তার সাথে আলিঙ্গন করলাম। সেই বুযুর্গ কালে খানকে বলেন, কালে খান! আপনি কবে আমাদের কাছে আসছেন? তখন কালে খান সাহেব বলেন, আমি তো এসেই গেছি। এরপর তিনি বলেন যে, যখন এক ব্যক্তির কাছে তিনি খলীফা সানীর ছবি দেখেন তখন তিনি তাকে চিনে ফেলেন এবং বলে উঠেন যে, এই বুযুর্গ ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর তিনি পত্রযোগে বয়আত করেন। তার বয়আতের পর তার স্ত্রীও বলেন যে, আপনার সাথে আমারও বয়আত করিয়ে দিন আর তিনিও বয়আত করেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। একইভাবে তাদের সন্তানদের ওপর মরহুমা ফাহ্‌মিদা ফাতেমা সাহেবার তরবিয়তের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার সন্তানরা বেশিরভাগ সময়েই তাকে রাতে উঠে আল্লাহ্‌ তা'লার দরবারে কাঁদতে দেখেছে। জুমুআর নামায পড়ার জন্য যখন মহিলাদের অনুমতি ছিল তখন তিনি জুমুআর নামাযের জন্য এক ঘন্টা পূর্বেই মসজিদে চলে যেতেন আর নফল নামায ও দোয়ায় সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি অনেক সাহসী, দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণী এবং ধৈর্যশীলা ছিলেন। তার স্বামী ১৯৬৫ এবং ৭১ সনের যুদ্ধে দুইবার বন্দি হন। প্রথমবার তো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার স্বামীর জীবিত থাকার বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি এবং ধরে নেওয়া হয় যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। এমনকি তার গায়েবানা জানাযার নামায পর্যন্ত পড়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মরহুমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তার স্বামী জীবিত আছেন এবং অবশ্যই ফিরে আসবেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'লা কৃপা করেন আর তার স্বামী মুক্তি লাভের পর ফিরে আসেন। মরহুমা শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব ছাড়া চার পুত্র এবং দুই কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার তিন পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। মুহাম্মদ জাভেদ সাহেব জাম্বিয়ায় মুবাল্লিগ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি মায়ের মৃত্যুতে পাকিস্তানে যেতে পারেন নি। আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমার সাথে কৃপা ও মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকে তার পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা হলো জনাব মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার হায়দারাবাদী সাহেবের, যিনি গত ২২ মে তারিখে ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। তার দাদা শেখ দাউদ আহমদ সাহেবের মাধ্যমে তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। প্রাথমিক বয়সে তার পিতা নিজের দুই পুত্রকে, অর্থাৎ মুহাম্মদ আহমদ আনোয়ার সাহেব এবং মজীদ আহমদ সাহেবকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছিলেন।

কাদিয়ানে মিনারাতুল মসীহতে আযান দেওয়ারও তার সৌভাগ্য হয়েছে। মুহাম্মদ আহমদ সাহেব শুরু থেকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.)-এর সাথে থাকেন এবং দেশবিভাগের পর হুযূরের সাথে রাবওয়ায় চলে আসেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহে.)-এর সাথে তার ড্রাইভার হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। তিনি তার শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করেন ফিজিক্যাল এজুকেশনে। তারপর উর্দূতে এম.এ. করেন ইসলামীয়াতে। অতঃপর ডি.পি.-এর কোর্স পাশ করেন। তিনি তালীমুল ইসলাম কলেজে দীর্ঘকাল সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি সেখানেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর সাময়িক ওয়াকফ করে ১৯৭৩ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি তিন বছর গাম্বিয়ায় অবস্থান করেন। ১৯৭৮ থেকে ৮৬ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়ায় মহিলা কলেজে ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮৮ সনে পাকিস্তান থেকে জার্মানী হিজরত করেন আর ২০০৯ সনে সেখান থেকে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এরপর থেকে এখানেই বসবাস করেন। মরহুমের চার পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে যাদের সবাই বিবাহিত। মরহুম জার্মানীর কাযা বোর্ডের নায়েব সদর ছিলেন। এক সময় জার্মানী জামা'তের অডিটরও ছিলেন। তার কন্যা আমাতুল মজীদ সাহেবা বলেন, আমার পিতা দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন। নিজের জীবনে তিনি শুধু নামায, কুরআন, রোযা এবং খিলাফতের সেবা করাকে নিজের ধ্যান-জ্ঞান মনে করতেন, আর আমাদের সবাইকেও তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমের সাথে কৃপা ও মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন।

আজকের শেষ যে জানাযা, তা হলো সিরিয়ার জনাব সেলিম হাসান আলজাবি সাহেবের। তিনি গত ৩০ জুন তারিখে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। তার কন্যা লুবনা আলজাবি সাহেবা এবং তার দৌহিত্রী হিব্বা আলজাবি সাহেবা, যিনি ডাক্তার বেলাল তাহের

সাহেবের স্ত্রী, এখানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। তিনি বলেন, সেলিম আলজাবি সাহেবের জন্ম হয়েছিল ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে দামেস্ক-**এর** উপকণ্ঠীয় অঞ্চলে। একজন সহজ সরল আহমদী কৃষক জনাব আবু যাহাব সাহেবের মাধ্যমে ১৮ বছর বয়সে জাবি সাহেবের আহমদীয়াতের সাথে পরিচয় ঘটে। এতে জাবি সাহেব ইস্তেখারা করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন আর স্বপ্নেই তাঁর(আ.) হাতে বয়আত করেন। পরবর্তীতে আবু যাহাব সাহেব তাকে ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকের আরবী অনুবাদ প্রদান করেন। এই পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে সিরিয়া জামা'তের তৎকালীন আমীর জনাব মুনীর আলহুসনী সাহেবের কাছে গিয়ে তিনি বয়আত করেন। তার পরিবারের মধ্যে পিতার পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা ছিল, কিন্তু মরহুম ছিলেন দৃঢ়-অবিচল। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগে তার পাকিস্তান যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাহচর্যে তিনি রাবওয়ায় ছয় বছর অতিবাহিত করেন আর সেখানেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং উর্দূ ভাষাও শিখেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে পাকিস্তানেই তার বিয়ে হয় এবং হুযূর তার বিয়ে পড়ান। অর্থাৎ তার স্ত্রী পাকিস্তানী ছিলেন।

মরহুমের পৌত্রী হেবা জাবী সাহেবা লিখেন, আমাদের দাদা সর্বদা আমাদেরকে উপদেশ দিতেন আর তালীম ও তরবিয়তের জন্য সময় দিতেন, এছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার মতো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন। কয়েক বছর পূর্বে তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছিলেন। তার ছয়জন সন্তান ছিল, এক ছেলে ডাক্তার নঈম আলজাবী সাহেব কয়েক বছর পূর্বে অপহৃত হয়েছিলেন আর আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ওয়াসীম আলজাবী সাহেব পোল্যাণ্ড জামা'তের সদস্য এবং হেবা জাবী'র পিতা। এছাড়া দুই কন্যা ও দুই পুত্র সিরিয়াতে বসাবাস করেন। হেবা জাবী সাহেবাও এখানে জামা'তের সেবা (করছেন) বিশেষভাবে বই-পুস্তক অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং কাজ করেন। তার স্বামী বেলাল তাহেরও অনুবাদের কাজ করেন আর ইনি তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় বরকত সৃষ্টি করুন আর তাদেরকে তত্ত্বজ্ঞানেও সমৃদ্ধ করুন। তার মেয়ে লুবনা আব্দুল খবীর আলজাবী লিখেন, (প্রয়াত পিতা) আমাদেরকে কুপ্রথা ও বিদআতের অনুসরণে বারণ করতেন আর আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন রচনা ও তবলীগ করার উপদেশ দিতেন। দরিদ্রদের পেছনে অনেক খরচ করতেন। সিরিয়া এবং লেবাননে মরহুমের মাধ্যমে অনেক মানুষ বয়আত করেন, তাদের মধ্যে খ্রিষ্টানরাও ছিল। তিনি আরো বলেন, মরহুম আমাদেরকে শেষ যে ওসিয়্যত করেছেন তাহলো, সদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে এবং যুগ খলীফার উপদেশাবলীর ওপর আমল করবে। তবলীগের ক্ষেত্রে আলস্য দেখাবে না, সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে সকল কাজ করবে আর সত্যের খাতিরে কোন প্রকার নির্যাতনের ভ্রুক্ষেপ করবে না।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট উমর আল্লাম সাহেব লিখেন, আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে আমরা প্রয়াত সেলীম আলজাবী সাহেব রচিত বই-পুস্তক পাঠ করতাম আর এতে যুগ ইমামের আবির্ভাব এবং তাঁর জামা'তের প্রতি ইঙ্গিত থাকতো। আমরা যখন তার সব বই পড়া শেষ করি এরপর তিনি আমাদেরকে মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বয়আত করার জন্য বলেন। এটি তার নিজস্ব একটি রীতি ছিল, সব জায়গায় এটি পুরোপুরি কার্যকর হওয়া আবশ্যক নয়। যাহোক, তিনি এভাবে তবলীগ করেন আর বহু লোককে তবলীগের মাধ্যমে আহমদী বানান। এরপর বলেন, এখন আমার বইপুস্তক বাদ দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণ ও জামা'তের পুস্তকাদি পাঠ করুন। তিনি আরো বলেন, আমরা যারা লেবাননের প্রথম দিকের আহমদী তারা মরহুমের মাধ্যমে বয়আত করেছিলাম আর আমরা এ বিষয়ে তার অনুগ্রহ স্বীকার করছি এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও তার জন্য দোয়া করি। বর্তমানে কানাডায় বসবাসকারী সিরিয়ান আহমদী মো'তাযাল কাযাক সাহেব বলেন, (আমি) সিরিয়ায় একটি স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলাম,তখন অসংখ্যবার আলজাবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। আমি দেখেছি, যখনই খিলাফতের উল্লেখ হতো তখন অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন, খিলাফতের চরণে আমার মৃত্যু হোক, এটিই আমার আকাঙ্ক্ষা। এখানে আরবী ডেস্কে কর্মরত আমাদের মুবাল্লিগ মীর আঞ্জুম পারভেজ সাহেব বলেন, খিলাফতের বরাতে যখনই কোন কথা বলা হতো, তা মাথা পেতে মেনে নিতেন আর অবলীলায় একথা বলতেন যে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা আমাকে যে নির্দেশ দিবে আমি তার আনুগত্য করবো। ২০১১ সনে সিরিয়া থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় যোগদান করেন আর বলতেন, আমার বাসনা হলো, এখানে যুগ খলীফার পদতলে আমার প্রাণ-বিসর্জণ দেওয়া আর আমার জন্য এর চেয়ে বড় সম্মানের আর কিছু নেই। জাবী সাহেবের মাধ্যমে অনেক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর তাদের মধ্যে সিংহভাগ জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবান আহমদী। আমাকে অনেকে চিঠিও লিখেছে যে, আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আর তার মাধ্যমেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। জাবী সাহেব আরো বলতেন, হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন, আমার পুস্তক 'হায়াতে কুদসী'র আরবী অনুবাদ কর যাতে আরবরা অবগত হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা কেমন ছিলেন? অতএব তিনি হায়াতে কুদসী বইটির আরবী অনুবাদও করেছিলেন। আরবী তো তার মাতৃভাষা ছিল, এছাড়া তিনি উর্দূও জানতেন আর খুব ভালোভাবে বলতে পারতেন, সেই সাথে ফার্সীও বলতে পারতেন। কাজ চালানোর মতো ইংরেজি ভাষাও তার জানা ছিল। ২০০৫ সনে আমি যখন কাদিয়ান জলসায় গিয়েছিলাম, সেখানেও স্বল্প সময়ের জন্য আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, কিন্তু পরম বিনয়ের সাথে। এরপর যুক্তরাজ্যের জলসায় এসেছিলেন, এখানেও আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একান্ত বিনয়ের সাথে বলেন, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং আমি পূর্ণ আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখি। আমার জন্য দোয়া করুন যাতে সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত থাকি। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও ষোল আনা বিশ্বস্ততার সাথে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন আর তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

যেমনটি আমি বলেছি, এখন জুমুআর নামাযের পর, সম্ভবত বলি নি, কিন্তু যাহোক, জুমুআর নামাযের সকলের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

১ম পাতার শেষাংশ.....

করেছেন, তাদের মধ্যে সেগুলি সবই পাওয়া যায়। ইহুদীদের কাছে কেবল এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত না করে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি খোদা এত বেশি করেছেন যে,তিনি ইসলামের ভিত্তিই রেখেছেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র উপর। অর্থাৎ এর উপর যে খোদা ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত কাজ নিজেই করতে সক্ষম। তাঁর কারো সাহায্যের মোটেই প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উপর ইসলামের ভিত্তি রাখা সত্ত্বেও আজ মুসলমানেদের মধ্যে এত বেশি শিরক পাওয়া যায় যে, এর তুলনায় অন্যান্য জাতির মধ্যে অনেক কম পরিমাণে শিরক রয়েছে। মুসলমানেরা কবরে কোন প্রকার বাধা ছাড়া এমনভাবে সেজদা করে যে খোদার সামনে সেজদাকারী এবং তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। আমি সব সময় আশ্চর্য হই যে, কোনও মুসলমানও কি কখনও কবরে সিজদা করতে পারে? আর সাক্ষ্য প্রদান করা সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু একবার আমরা যখন কয়েকজন সঙ্গী ভারতে ইসলামী মাদ্রাসা দেখার উদ্দেশ্যে লখনউ যাই, তখন সেখানে ফিরিঙ্গি মহল মাদ্রাসা দেখে আমি পুলকিত হই। যোগ্য এবং বিদ্বান শিক্ষক ছিলেন সেখানে। ছাত্ররাও মেধাবী ও বিচক্ষণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই মাদ্রাসা এবং আরও কিছু মাদ্রাসা দেখার পর সন্ধ্যায় আমরা বাসার দিকে ফিরে আসার সময় একটি কবরের সামনে যে ব্যক্তিকে পুরোপুরি সিজদারত অবস্থায় দেখলাম, তিনি ছিলেন ফিরিঙ্গি মহল মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। আমি তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলাম যে এই ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেও তার মূল্যায়ন করল না; কবরে সিজদা করতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে মুসলমানদের এই কারণেই ইহুদীদের কথা উল্লেখ করেছেন যে একদিন তোমরাও এমনটি করতে আরম্ভ করবে।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪, কাদিয়ান থেকে মূদ্রিত)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তওবার অর্থ হল মানুষ পাপকে এমন স্বীকারুক্তি সহকারে ত্যাগ করবে যে এরপর যদি তাকে আগুনেও নিক্ষেপ করা হয়, তবুও কোনমতেই সে পাপ করবে না। (চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৯০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

রসুলের বাণী

অন্তরে খোদার পরিচিতি, মুখে খোদার স্বীকারুক্তি এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে চলার নামই হল ঈমান। (ইবনে মাজা, বা ফিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

জুমআর খুতবা

এই জামাত প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন জগতের কলুষতা থেকে বের হয়ে প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করে এবং ফিরিশতাদের ন্যায় জীবন যাপন করে।

'আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর পৃথিবীতে এটিই সর্বপ্রথম সর্ববাদি সম্মত মত ছিল, এর দ্বারা হযরত মসীহর মৃত্যুর বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল।

"আমার আগমনের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত উদ্দেশ্য হলো, তাদের প্রকৃত তাক্বওয়া ও পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি খ্রিষ্টানদের জন্য- তাদের ক্রুশ ভঙ্গ হওয়া আর তাদেরকে কৃত্রিম খোদা দৃষ্টিগোচর না হওয়া।"

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আহমদীরা তো সবচেয়ে বেশি খাতামান্নাবীঈন পদমর্যাদাটির মর্ম উপলব্ধি করে আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন।

আমি সত্য বলছি এবং খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামা'ত মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আর আমার বিশ্বাস, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে এবং যতটা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেতে পারে, তা শুধু এবং শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ ভালোবাসার মাধ্যমেই সম্ভব, নতুবা নয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৩১ শে জুলাই , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৩১ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ সকালে আমরা ঈদের নামায পড়েছি আবার আজকে জুমুআও। ঈদ এবং জুমুআ একই দিনে সমবেত হলে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা হলো, কেউ চাইলে জুমুআর পরিবর্তে যোহরের নামাযও পড়তে পারে, এর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি একবার এমনই এক উপলক্ষ্যে তিনি (সা.) বলেছেন, আমরা জুমুআ পড়বো। তিনি (সা.) জুমুআ পড়েছিলেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, হাদীস-১৩১০,১৩১১,১৩১২)

তাই আমি এই উদ্ধৃতির আলোকে (যুক্তরাজ্যের) আমীর সাহেবকে এ কথাই বলেছিলাম যে, যারা যোহরের নামায পড়তে চায় তারা জুমুআ না পড়ে নির্দ্বিধায় বাজামা'ত যোহরের নামায পড়তে পারে। এমনিতেও বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশি লোক মসজিদে সমবেত হওয়া সম্ভব নয়, তারা বাড়িতেই অবস্থান করছে, আর বাড়িতে যদি ব্যস্ততা না থাকে তাহলে পূর্বে যেভাবে জুমুআ পড়তো আজও সেভাবেই পড়তে পারে। অপরদিকে যাদের ব্যস্ততা রয়েছে তারা যোহরের নামাযও পড়তে পারে, কিন্তু আমরা এখানে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে আজ জুমুআ পড়ছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.)'র যুগে একবার এভাবেই ঈদ-উল-আযহা ও জুমুআ একদিনে আসে। তখন বিভিন্ন লোক নিজ নিজ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, জুমুআ না পড়ে যোহরের নামায পড়া উচিত। যারা যোহরের নামায পড়ার বিষয়ে জোর দিচ্ছিল, তিনি (রা.) তাদেরকে চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের খোদা কতই না উদার! তিনি আমাদেরকে (একদিনে) দু'টি ঈদ উপহার দিয়েছেন। এখন কেউ যদি ঘি মাখানো দু'টো চাপাতি বা রুটি পায় তাহলে সে একটি কেন প্রত্যাখ্যান করবে? তার একান্ত কোন অপারগতা না থাকলে সে তো দু'টোই নিবে। মহানবী (সা.) যে এর অনুমতি প্রদান করেছেন, এর কারণ হলো, কেউ যদি বাধ্য হয়ে জুমুআর পরিবর্তে যোহরের নামায পড়ে তাহলে অন্যদের তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়। কিছু মানুষের ঈদ ও জুমুআর উভয়টি পড়ার সুযোগ হলে, সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে অন্যদের আপত্তি করা এবং একথা বলা উচিত নয় যে তারা ছাড়ের সুযোগ গ্রহণ করেনি। যাহোক অবকাশ থাকলেও মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবনে আমরা এটিই দেখতে পাই যে, তিনি (সা.) বলেছেন, আমরা জুমুআ পড়বো।

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, আজ আমরা জুমুআ পড়ছি, কিন্তু সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রদান করব। এজন্য আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি চয়ন করেছি যাতে তিনি (আ.) নিজ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর জামাতের মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানা এবং বাস্তবে তাঁর জীবন্ত নবী হওয়ার বিষয়েও খুবই তত্ত্বসমৃদ্ধ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, আর মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদাও তুলে ধরেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের প্রতি এই অপবাদ আরোপ করে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আমরা (নাকি) নাঊযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা খাট করে থাকি। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা পাকিস্তানের বিভিন্ন সংসদে এসব রেজুলুশান পাশ করিয়ে বড়ই গর্ব করছে যে, দেখ! আমরা মহানবী (সা.)-এর নামের সাথে খাতামান্নাবীঈন শব্দটি লিখা আবশ্যক করে তাঁর প্রতি কতই না গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছি এবং তাঁর পদমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ করেছি। তাদের হৃদয়ও যদি সত্যিকার অর্থে একই সাক্ষ্য দেয় আর বাস্তবে তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের প্রেরণা জোগায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত ভালো কথা। কিন্তু তাদেরকে তিনি যে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন তাদের কর্ম তা থেকে যোজন যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে । যদি মহানবী (সা.)-এর যুগে ফিরে গিয়ে সেই শিক্ষা এবং সেই আদর্শ অবলম্বন করে যা তিনি (সা.) প্রদান করেছেন এবং যার ওপর তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহলে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের গলা কাটার কথা নয়, বরং যুগ ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত করার জন্য তাদের ছুটে আসার কথা।

তারা মনে করে, খাতামান্নাবীঈন শব্দটিকে লিখা আবশ্যক করে এক মহান কাজ করে ফেলেছে আর আহমদীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই নির্বোধদের এটি জানা নেই যে, আহমদীরা তো সবচেয়ে বেশি খাতামান্নাবীঈন পদমর্যাদাটির মর্ম উপলব্ধি করে আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সে শক্তি রয়েছে যার ধারেপাশেও তারা পৌঁছতে পারবে না। তাঁর (আ.) প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি কর্মে হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জন্য এমন প্রেম ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় যা তারা ভাবতেও পারে না । এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসংখ্য উক্তি, রচনা ও বক্তব্য রয়েছে। এখন আমি উদাহরস্বরূপ সে গুলোর কয়েকটি উপস্থাপন করব। স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য এবং জামা'তের উন্নতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিরোধীদের সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন,

"আমার আগমনের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত উদ্দেশ্য হলো, তাদের প্রকৃত তাক্বওয়া ও পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ

তারা যেন সেই খাঁটি মুসলমান হয়ে যায় যেমনটি আল্লাহ মুসলমান শব্দের ব্যাবহারিক অর্থে দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্যের সহিত আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কী? খ্রিষ্টানদের জন্য তাদের ক্রুশ ভঙ্গ হওয়া আর তাদেরকে কৃত্রিম খোদা দৃষ্টিগোচর না হওয়া। জগদ্বাসী যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় এবং এক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত হয়। আমার (আগমনের) এসব উদ্দেশ্যকে দেখেও তারা কেন আমার বিরোধিতা করে? তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যেসব কাজ স্বভাবগত কপটতা এবং পার্থিব নোংরামির বশবর্তী হয়ে করা হবে সে গুলো নিজেই সেই বিষে ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি আমার হৃদয়ে কোন প্রকার কপটতা থাকে, নোংরামি থেকে থাকে, তাহলে এমনসব কাজ আশিষ মণ্ডিত হয় না, বরং সে সবের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়, সে গুলো এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে বা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, মিথ্যাবাদী কি কখনো সফল হতে পারে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (সূরা মু'মেন: ২৯)। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তাকে হেদায়েত দান করেন না যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং ঘোর মিথ্যাবাদী। إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (সূরা মু'মেন: ২৯)। তিনি বলেন, মিথ্যাবাদীর ধ্বংসের জন্য তার মিথ্যাই যথেষ্ট। অর্থাৎ যে মিথ্যাবাদী, তার মিথ্যা-ই তাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ এবং তাঁর রসূলের কল্যাণরাজি প্রকাশ ও প্রমাণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত বৃক্ষ হয় তার সুরক্ষা তো স্বয়ং ফিরিশতারা করে থাকে। এটি বান্দাদের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু এই কাজ আরম্ভ করেছেন তাই তাঁর ফিরিশতারা এর সুরক্ষা করে। কে আছে যে এটিকে ধ্বংস করতে পারে?– এটি এক চ্যালেঞ্জ। যত বিরোধিতা হয় ততই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি হয়। তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! আমার জামা'ত যদি কেবল দোকানদারি বা ব্যবসা হয়ে থাকে তাহলে এর নামচিহ্ন পর্যন্ত মুছে যাবে, কিন্তু এটি যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর অবশ্যই এটি তাঁর পক্ষ থেকে, তাহলে সমস্ত জগদ্বাসী এর বিরোধিতা করলেও এটি বৃদ্ধি পাবে, প্রসারিত হবে আর ফিরিশতারা এর সুরক্ষা করবে। তিনি বলেন, যদি এক ব্যক্তিও আমার সাথে না থাকে আর কেউ সাহায্য না করে তবুও আমি বিশ্বাস করি, এই জামা'ত সফলতা লাভ করবে।

তিনি বলেন, আমি বিরোধিতার পরোয়া করি না, কেননা তা চিরন্তন রীতি। আমি এটিকেও আমার জামা'তের উন্নতির জন্য আবশ্যক জ্ঞান করি। কখনো এমন হয় নি যে, খোদা তা'লার কোন প্রত্যাদিষ্টও খলীফা জগতে আগমন করেছেন আর মানুষ সুবোধ বালকের ন্যায় তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। জগতের অবস্থা বড়ই দুঃখজনক, মানুষ যতই সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হোক না কেন, অন্যরা তার পিছু ছাড়ে না। তারা আপত্তি করতেই থাকে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের উন্নতি অসাধারণভাবে হচ্ছে।

বর্তমানে আমরা দেখছি যে, দু'শর অধিক দেশে তাঁর জামা'তেবা তাঁর হাতে বয়আতকারী নিষ্ঠাবানরা বিদ্যমান, [যখন তিনি এটি বর্ণনা করেছিলেন, তখন তিনি একথা বলেছেন তাঁর ভাষ্যানুসারে (অর্থাৎ বয়আতকারীদের) সংখ্যা শতকের কোঠায় থাকত। এখন তো প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যাত্মা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত করছেন।] তিনি (আ.) বলেন, এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন করে এবং ফিরিশতাদের ন্যায় জীবন যাপন করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৮-১৪৯)

অতএব তাঁর (আ.) এই উক্তি অনুযায়ী আমাদেরও দায়িত্ব হলো, নিজেদের অবস্থাকে সঠিক ইসলামী শিক্ষার অধীনস্ত করা। এটিই শত্রুদের মুখ বন্ধ করার এবং তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার সঠিক পদ্ধতি।

অতঃপর নিজের এবং নিজ জামা'তের পরিপূর্ণ ঈমান এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্যের ঘোষণা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

" আমি সত্য বলছি এবং খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামা'ত মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আর আমার বিশ্বাস, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে এবং যতটা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য পেতে পারে, তা শুধু এবং শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ ভালোবাসার মাধ্যমেই সম্ভব, নতুবা নয়। তিনি (সা.) ছাড়া এখন পুণ্যের আর কোন পথ নেই। হ্যাঁ, একথাও সত্য যে, আমি আদৌ এটি বিশ্বাস করি না যে, মসীহ্ (আ.)-এই নশ্বর দেহ নিয়ে জীবিত আকাশে আরোহন করেছেন এবং এখনও জীবিত বসে আছেন। কেননা এই বিশ্বাস পোষনে মহানবী (সা.)-এর চরম মর্যাদাহানি এবং অবমাননা হয়। আমি এক মুহূর্তের জন্যও এ অবমাননা সহ্য করতে পারি না। সবাই জানে যে, মহানবী (সা.) তেষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন এবং পবিত্র নগরী মদিনায় তাঁর রওজা রয়েছে। প্রতি বছর সেখানে হাজার হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে যায়। এখন যদি মসীহ্র মৃত্যুতে বিশ্বাস করা বা মৃত্যুকে তাঁর প্রতি আরোপিত করা তার অবমাননা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব, মহানবী (সা.)এর ক্ষেত্রে কেন এ অবমাননা ও ঔদ্ধত্য শিরোধার্য করা হয়? তাঁর (সা.)সম্পর্কে কেন বলা হয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সমাহিত আছেন? তিনি (আ.) বলেন, তোমরা বড় গর্বের সাথে বলে দাও যে, তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। মৃত্যুগাথা বর্ণনাকারীরা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা বড় সুলোলিত কণ্ঠে বর্ণনা করে আর কাফিরদের মোকাবিলায়ও তোমরা খুবই প্রশস্ত ললাটে স্বীকার করে নাও যে, তিনি (সা.)মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, তাই আমার বোধগম্য হয় না যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে তোমাদের কী এমন কষ্ট হয় যে, তোমাদের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। (এখনও কতিপয় লোক, কতিপয় ফির্কা, কতিপয় আলেম এই হৈ চৈ করে থাকে যে, দেখ! আহমদীরা কী সর্বনাশ না করলো!তাদের কতিপয় তো ঈসা (আ.)-এর আগমনের কথা অস্বীকার করে বসেছে যে, তিনি আর আসবেন না, আর কতিপয় লোক বলে, তিনি আসবেন, কিন্তু তিনি ইনি (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব) নন কেননা ঈসা (আ.) এখনও জীবিত আছেন।)

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের কোন দুঃখ হতো না যদি তোমরা মহানবী (সা.)-এর জন্যও 'ওফাত' বা মৃত্যু শব্দটি শুনে একইভাবে অশ্রু বিসর্জন দিতে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, খাতামান্নাবীঈন ও দু'জাহানের বাদশাহ্ (সা.)-এর ক্ষেত্রে তোমরা সানন্দে 'মৃত্যু' মেনে নাও, অথচ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে নিজেকে মহানবী (সা.)-এর জুতার ফিতা খোলার যোগ্য বলেও মনে করে না, তাকে তোমরা জীবিত বিশ্বাস কর আর তার জন্য মৃত্যু শব্দ মুখে আনলেই তোমরা ক্ষেপে যাও। মহানবী (সা.) যদি আজ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন তাহলে কোন সমস্যা ছিল না, কেননা তিনি সেই মহান হেদায়েত নিয়ে এসেছিলেন যার দৃষ্টান্ত জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তিনি এমন সব ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, আদম (আ.) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ অনুরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়। তিনি বলেন, আমি তোমাদের সত্য করে বলছি, মহানবী (সা.)-এর সত্তার যতটা প্রয়োজন বিশ্ববাসী এবং মুসলমানদের ছিল, মসীহ (আ.)-এর সত্তার প্রয়োজন ততটা ছিল না। এছাড়া তাঁর (সা.) সত্তা হলো সেই কল্যাণমণ্ডিত সত্তা যে, তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন সাহাবীরা উন্মাদের মতো হয়ে যান। এমনকি হযরত উমর (রা.) খাপ থেকে তরবারি বের করে ফেলেন এবং বলেন, কেউ যদি মহানবী (সা.)-কে মৃত বলে তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। এই উত্তেজনাকর অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কে এক বিশেষ জ্যোতি ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। তিনি (রা.) সবাইকে সমবেত করে খুতবা প্রদান করেন। তিনি সেখানে আয়াত وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) পাঠ করেন অর্থাৎ মহানবী (সা.) একজন রসূলমাত্র আর তার পূর্বে যত রসূল এসেছেন তাঁদের সবাই ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বলেন, এখন আপনারা অভিনিবেশ করে দেখুন আর গভীরভাবে চিন্তা করে বলুন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে এই আয়াত কেন পাঠ করেছিলেন? আর এতে তার কী উদ্দেশ্য ছিল বা তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? তা-ও আবার এমন পরিস্থিতিতে যখন কিনা সকল সাহাবীই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি আর আপনারা একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের ফলে সাহাবীরা গভীর মর্মযাতনায় ভুগছিলেন আর এই মৃত্যুকে তারা অকাল মৃত্যু মনে করছিলেন। তারা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনতে নারাজ ছিলেন। এমন অবস্থা ও পরিস্থিতে, যখন কিনা হযরত উমরের মতো মহান সাহাবী এতটা উত্তেজিত ছিলেন যে এ আয়াত যদি তাকে প্রবোধ না দিত তাহলে কোনভাবে তার ক্রোধ প্রশমিত হতো না। তারা অর্থাৎ সাহাবিরা যদি জানতেন বা বিশ্বাস রাখতেন যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন তাহলে তারা জীবিতই মারা যেতেন। কেননা, তারা মহানবী (সা.)-এর প্রেমিক ছিলেন আর তাঁর (সা.) জীবন ছাড়া অন্য কারো জীবিত থাকা সহ্যই করতে পারতেন না। সেক্ষেত্রে চোখের সামনে মহানবী (সা.)-কে মৃত অবস্থায় দেখে মসীহ্কে জীবিত বিশ্বাস করা কোনওভাবে তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) খুতবা পড়ে শোনাতেই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 3 Sep, 2020 Issue No.36

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। তখন সাহাবীরা মদিনার অলি-গলিতে এই আয়াত পাঠ করে বেড়ান আর তারা মনে করেন, এই আয়াত যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সে সময় হাস্‌সান বিন সাবেত (রা.)একটি শোকগাঁথা লিখেছিলেন, যাতে তিনি লিখেন, কুন্‌তাস্‌ সাওয়াদা লে-নাযেরী, ফা-আমেয়া আলায়কান্‌ নাযেরু / মান শাআ বা'দাকা ফাল্‌-ইয়ামুত, ফা-আলাইকা কুনতু উহাযেরু ' যেহেতু উপরোক্ত আয়াত স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, সব রসূলই মারা গেছেন, তাই হাস্‌সান বিন সাবেতও বলেন যে, এখন অন্য কারো মৃত্যুর কোন পরোয়া নেই। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখ, মহানবী (সা.)-এর বিপরীতে অন্য কারো জীবিত থাকা সাহাবীদের জন্য চরম কষ্টের কারণ ছিল আর তারা তা সহ্যই করতে পারতেন না। একইভাবে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে এটি প্রথম ইজমা বা সর্ববাদি সম্মত মত ছিল যা এই বিশ্বে সংঘটিত হয়েছিল আর এর দ্বারা হযরত মসীহ্‌ (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়েও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৬০) (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২২৪-২২৭)

এরপর মহানবী (সা.)-এর মাকাম ও পদমর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আক্বদাস মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেন,

সেই মানুষ, যিনি নিজ সত্তা, নিজ গুণাবলী, নিজ কর্ম, নিজ আমল এবং নিজ আধ্যাত্মিক ও পবিত্র শক্তিবৃত্তির খরস্রোতা নদীর মাধ্যমে জ্ঞান, কর্ম নিষ্ঠা আর অবিচলতার পূর্ণাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং পূর্ণ মানব আখ্যায়িত হয়েছেন, অর্থাৎ কোনদিকই বাদ থাকে নি; জ্ঞানগত, কর্মগত ও সততার মানদণ্ডের দিক থেকে, দৃঢ় প্রত্যয় বা অবিচলতার দিক থেকে এবং জ্ঞান ও তত্ত্বের দিক থেকেই হোক না কেন। সুতরাং তিনি ছিলেন অনন্য দৃষ্টান্ত, তাই তিনি পরিপূর্ণ মানব আখ্যায়িত হয়েছেন। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, সেই মানব,যিনি ছিলেন সর্বাধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং পরিপূর্ণ মানব ও পরিপূর্ণ নবী,আর পূর্ণাঙ্গীন কল্যাণসহ আগমণ করেছিলেন। যাঁর হাতে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও হাশরের ফলে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে আর তাঁর আগমনে মৃত এক পুরো জগৎ জীবিত হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ তারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছে। সেই কল্যাণময় নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতমুল মুরসালীন ও ফখরুন্‌ নবীঈন মহা সম্মানিত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হে আমাদের প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি তুমি এমন রহমত ও আশিস বর্ষণ কর যা সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ অবধি তুমি কারো প্রতি বর্ষণ কর নি। এই সুমহান নবী যদি এ পৃথিবীতে না আসতেন তাহলে এখন পর্যন্ত যত ছোট ছোট নবী পৃথিবীতে এসেছেন যেমন-ইউনুস, আইয়্যুব, মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম, মালাকী, ইয়াহ্‌ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ নবীর সত্যতার কোন প্রমাণ আমাদের কাছে ছিল না; যদিও তাঁরা সবাই ছিলেন নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত ও খোদাতা'লার প্রিয় নবী। এটি সেই মহান নবীর অনুগ্রহ যে, তাঁরাও পৃথিবীতে সত্য পরিগণিত হয়েছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলায়হি ওয়া আলেহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর মাকাম ও মর্যাদার সঠিক ব্যুৎপত্তি দান করে তাঁর (সা.)প্রতি অনবরত দরূদ প্রেরণের সামর্থ দান করুন এবং আমরা যেন আল্লাহ্‌ তা'লার সমীপে পূর্বাপেক্ষা অধিক বিনত হই। আমাদের কর্ম দ্বারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি (আমাদের) ভালোবাসার প্রমাণ উপস্থাপন এবং আমাদের হৃদয়ে এ (ভালোবাসা)কে প্রথিত করাই হলো এর মূল পন্থা বা মাধ্যম। এমন করলেই আমরা বিরোধীদের বিরোধিতার উত্তর দিতে পারব,অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারিক অবস্থাই সেসব বিরোধীর বিরোধিতার উত্তর দিবে। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

২এর পাতার পর....

অনুসারে এই অধমের পক্ষ থেকে একটি লিখিত আপত্তি উপস্থাপিত হয় যার অর্থ ছিল, আর্যসমাজীদের ধর্মমত অনুসারে খোদা তা'লার স্রষ্টা হওয়া এবং এর কারণে অনিবার্যভাবে চিরন্তন মুক্তির অস্বীকারকারী হওয়া খোদা তা'লার একত্ব এবং করুণা, উভয় দূরে সরে যায়। এই আপত্তি যখন সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হয়, তখন মাস্টার সাহেব এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন যা তিনিই বলতে পারতেন আর জলসায় উপস্থিত সেই সমস্ত লোকও নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন যারা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। মাস্টার সাহেব সেই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারেন নি যে তিনি এর কি উত্তর দিবেন। তাই অসহায় অজুহাত সন্ধান করার ছুতোয় প্রায় সওয়া ঘন্টা একথা বলেই কাটিয়ে দেন যে, এটি একটি নয় বরং দুটি প্রশ্ন। তখন এর উত্তরে বলা হল যে এটি দুটির পরিবর্তে একটিই প্রশ্ন।..... যাইহোক অনেক বোঝানোর পর মাস্টার সাহেব কিছুটা বুঝতে পারেন এবং উত্তর লিখতে শুরু করেন। তিন ঘন্টা পর্যন্ত অধিকাংশ সময় দুঃখ ও অভিমানের পর প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর লিপিবদ্ধ করে পাঠ করে শোনান। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ, যেটি মুক্তি সম্পর্কে ছিল, তার উত্তরে তিনি লেখেন, এর উত্তর আমি বাড়ি গিয়ে লিখে পাঠাব। কাজেই এই পক্ষ থেকে এমন উত্তর নিতে অস্বীকার করা হল এবং বলা হল যে আপনি যা কিছু লিখবেন তা এই জলসায় শ্রোতাদের সামনেই লিখুন। যদি বাড়িতে বসেই লিখতেন তবে এখানে জলসার মাধ্যমে বাহাস বা তর্কযুদ্ধ করার প্রয়োজন কি ছিল? কিন্তু মাস্টার সাহেব সম্মত হলেন না। কেননা যদি সম্মত হতেন, তবে অবস্থা অন্যরকম হত। এখন সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে মাস্টার সাহেব যখন কোনমতেই লিখতে রাজি হলেন না, তখন নিরুপায় হয়ে বলতে হল যে যতটুকু আপনি লিখেছেন সেটুকুই দিন যাতে আমরা উপসংহার লিখতে পারি। এর উত্তরে তিনি বললেন, এখন আমার 'সমাজ'-এর সময় হয়েছে, আর বসে থাকতে পারব না। বেচারা যখন যেতে উদ্যত হলেন, তখন তাকে বলা হল যে এটা আপনি ভাল করলেন না, আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সেটি আপনি ভঙ্গ করলেন। আপনি পুরো উত্তরও দিলেন না, আর আমাদেরকেও উপসংহার লিখতে দিলেন না। যাইহোক, নিরুপায় হয়ে উপসংহারও নিজের পক্ষ থেকে লিখে পত্রিকায় দেওয়া হবে। কথাগুলি শুনে মাস্টার সাহেব নিজের সঙ্গীদের নিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে যান। আর জলসায় উপস্থিত শ্রোতারা ভালভাবে জেনে যান যে মাস্টার সাহেবের এই কাজ এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত ছিল মাত্র।

(সুরমা চাশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২, পৃ: ৫৪)

পুস্তক অধ্যায়ন করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বাগ্মী, সাবলীল এবং যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তব্যের সামনে লালা সাহেব দাঁড়াতেই পারেন নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রত্যেক বিপক্ষে অতিকষ্টে দুই চার লাইন ভিত্তিহীন ও অনর্থক আপত্তি খাড়া করে লালা সাহেব কোনও মত নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন লালা সাহেব কেবল আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমের প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করে দিবেন। অনুরূপ একটি আপত্তি লালা মুরলীধরন সাহেব লেখেন যা নিম্নরূপ-

"মির্যা সাহেব নিজের ধর্মবিশ্বাস স্মরণ করে দেখুন, তাঁর বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মানুষ নাজাত বা মুক্তি লাভ করে বেহেশত নামে একটি স্থানে অবস্থান করবে, যেখানে খোদা তা'লা উৎকৃষ্টমানের উদ্যান প্রস্তুত করে রেখেছেন, পবিত্র নারী বা হুর রয়েছে, সুরার নদী প্রবাহিত রয়েছে। অর্থাৎ নাজাতপ্রাপ্ত অবস্থাতেও সেখানে জাগতিক উপকরণ বিদ্যমান আছে। এর বেশি কিছু না। বরং সেখানে সেই সমস্ত বিষয়ও থাকবে যেগুলি এখানে নিষিদ্ধ, যেমন সুরা এবং একাধিক নারী।"

(সুরমা চাশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২, পৃ: ৫৪) (ক্রমশ.....)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir